প্রাথমিক বিজ্ঞান

পঞ্চম শ্রেণি

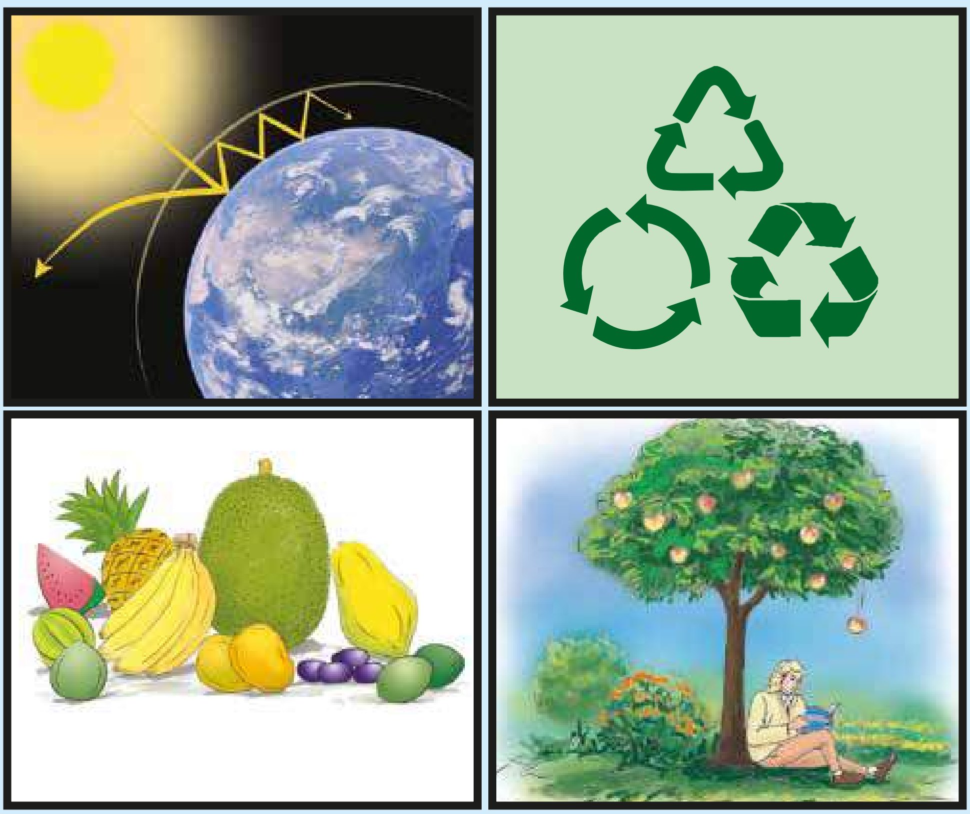

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

প্রাথমিক বিজ্ঞান

পঞ্চম শ্রেণি

[পরীক্ষামূলক সংস্করণ]

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা- ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর, ২০২৫

রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর আহমদ ওবায়দুস সাত্তার ভূইয়া

প্রফেসর মাফরুহা নাজনীন

প্রফেসর সালমা আক্তার

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ নূরুল বাশার

প্রফেসর ড. মো: ইকবাল হোসেন

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

শাহানাজ বেগম

মো: আখলাক হোসেন

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ

চিত্রাঙ্কন

জহিরুল ইসলাম ভূঞা সেতু

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স

জহিরুল ইসলাম ভূঞা সেতু

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করাও এই স্তরের শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান অনুসরণ ও উন্নত বিশ্বের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অংশীজনদের চাহিদা ও মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ ২০২৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহ ইতোমধ্যে পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল ও ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটির প্রতি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশে সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

পঞ্চম শ্রেণির 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণিতে সাধারণত দশ বছরের অধিক বয়সের শিশুরা পাঠগ্রহণ করে। বয়সের কথা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তকে শিখন বিষয়ের উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে যেন সক্ষম হয়, সে চেষ্টা করা হয়েছে। পাঁচটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকেই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্তকরণ ও সমন্বয় কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক-প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, চিত্রশিল্পী এবং ইনডিজাইনারসহ যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্তকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. শিক্ষার্থী-শিক্ষকবান্ধব

- শিখনের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর বয়সের স্তর বিবেচনায় রেখে বিন্যস্ত করা হয়েছে।
- বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- শ্রেণিউপযোগী, সহজ ও সাবলীল ভাষায় বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। শিরোনাম, উপশিরোনাম এবং পর্যাপ্ত রঙিন ছবি বা চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।
- বিজ্ঞানের বিমূর্ত বিষয়গুলোকে রঙিন ছবি বা চিত্র ব্যবহার করে যথাযথ বর্ণনার মাধ্যমে বোধগম্য উপায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- প্রতিটি অধ্যায়সংশ্লিষ্ট নতুন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রঙিন ও মোটা অক্ষরে লেখা হয়েছে।
- এই পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বিজ্ঞানের নতুন শব্দগুলোর সহজ ব্যাখ্যা দিয়ে পাঠ্যপুস্তকের শেষে শব্দকোষ সংযুক্ত করা হয়েছে।

২. অনুসন্ধানমূলক এবং সক্রিয় শিখনে গুরুত্ব প্রদান

- অনুসন্ধানমূলক, সমস্যা সমাধানভিত্তিক এবং সক্রিয় শিখনে গুরুত্ব প্রদানের জন্য প্রতিটি পাঠ একটি প্রশ্ন বা Key Question- এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে।
- বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুগুলো কাজের মাধ্যমে শেখার সুযোগ রাখা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে তাদের মতামত লেখার সুযোগ রাখা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীর সুবিন্যস্ত এবং সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা বিকাশের জন্য পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু, কাজ ও পরীক্ষণ সংযোজন করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন যাচাই করার জন্য মূল্যায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে।
- সক্রিয় শিখন এবং অভিজ্ঞতানির্ভর ও সহযোগিতামূলক শিখনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
- প্রতিটি কাজ বা পরীক্ষণের শেষে কাজের সারসংক্ষেপ বা পরীক্ষার ফলাফল উপাস্থাপন করা হয়েছে।
- সারসংক্ষেপ বা ফলাফলের শেষে 'আরও কিছু জানি' শিরোনামের আলোকে পর্যাপ্ত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরীক্ষণসংশ্লিষ্ট সহজলভ্য বিকল্প উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

৩. শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে গুরুত্ব প্রদান

- বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা যেমন : পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, তুলনাকরণ, পরিমাপকরণ ইত্যাদি অর্জনে সহায়ক হয়, এরূপ হাতেকলমে কাজের পর্যাপ্ত সুযোগ রাখা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা, প্রকাশ করার ক্ষমতা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের জন্য দলগত এবং জোড়ায় আলোচনামূলক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সূচিপত্র

অধ্যায়ের নম্বর	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১	জীবের আবাসস্থল	১-১০
অধ্যায় ২	জীব ও পরিবেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা	১১-২১
অধ্যায় ৩	খাদ্য	২২-৩০
অধ্যায় ৪	বয়ঃসন্ধিকাল	৩১-৩৯
অধ্যায় ৫	পদার্থের গঠন	৪০-৪৭
অধ্যায় ৬	শক্তির রূপান্তর	৪৮-৬০
অধ্যায় ৭	বলের ধারণা	৬১-৭১
অধ্যায় ৮	ভূমিরূপ	৭২-৮৪
অধ্যায় ৯	পরিবেশ সংরক্ষণ	৮৫-৯০
অধ্যায় ১০	পৃথিবীর গতি	৯১-১০১
অধ্যায় ১১	জলবায়ু পরিবর্তন	১০২-১১৭
অধ্যায় ১২	আমাদের জীবনে প্রযুক্তি	১১৮-১২৮
অধ্যায় ১৩	সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১২৯-১৫৫
	শব্দকোষ	১৫৬-১৫৯

চরিত্র ও প্রতীক

১) চরিত্র

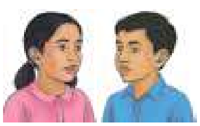

জুঁই দিপু

তোমার বিজ্ঞান শিখনে জুঁই এবং দিপু কিছু ইঙ্গিত অথবা ধারণা দেবে। এসো আমরা একসঙ্গে বিজ্ঞান শিখি।

২) প্রতীক

কাজ : এসো আমরা পর্যবেক্ষণ করি, অনুসন্ধান করি এবং পরীক্ষা করে দেখি!

সাবধান হও : নিরাপদ থাকার জন্য চলো আমরা সতর্কতার সাথে কাজ করি!

অধ্যায় ১

জীবের আবাসস্থল

উদ্ভিদ এবং প্রাণীসহ আরও অনেক বিচিত্র রকমের জীব নিয়ে জীবজগৎ গঠিত। জীবজগতে বিচিত্র ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে। কোনো কোনো জীব স্থলভাগ বা মাটিতে বাস করে। কেউ আবার পানিতে বা মাটি ও পানি উভয় স্থানে বসবাস করে। কোনো কোনো জীবের প্রয়োজন ছায়াযুক্ত পরিবেশ, আবার কারো প্রয়োজন আলো আছে এমন পরিবেশ। এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন জীবের আবাসস্থল, বিভিন্ন আবাসস্থলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ধরন এবং পরিবেশে তাদের টিকে থাকার কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে জানব।

১. জীবের আবাসস্থল

যেখানে কোনো জীব স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে সেটাই জীবের আবাসস্থল।

? জীবের আবাসস্থলগুলো কী কী?

কাজ: উদ্ভিদ ও প্রাণী কোথায় জন্মে তা খুঁজে বের করা।

যা করতে হবে

১. বিদ্যালয় এবং নিজ বাড়ির আশপাশে যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখেছি সেগুলোর নাম এবং এরা কোথায় জন্মেছে বা বাস করে তা নিচের ছকে লেখো।

উদ্ভিদের নাম	আবাসস্থল	প্রাণীর নাম	আবাসস্থল

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

২. কয়েকজন সহপাঠীর সাথে ছকের তথ্য নিয়ে আলোচনা করি এবং জীবের আবাসস্থল সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করি।

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন জীব বিভিন্ন ধরনের আবাসস্থলে জন্মে ও বসবাস করে। জল বা স্থলভেদে যেমন বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ জন্মে, তেমনি বিভিন্ন ধরনের আবাসস্থলে ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রাণী বাস করে।

বিভিন্ন আবাসস্থলের বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে আরও কিছু জানি

জীবের বসবাসের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ রয়েছে। যেমন– স্থলজ, জলজ, মেরু অঞ্চলের পরিবেশ। এসব পরিবেশে বসবাসরত প্রাণীদের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। পরিবেশের বিভিন্ন আবাসস্থলের যেমন ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনি এখানে বসবাসকারী বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর মধ্যেও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

বিভিন্ন পরিবেশে উদ্ভিদ

স্থলজ আবাসস্থল

মাটি বা ভূমির পরিবেশ হলো স্থলজ আবাসস্থল। উদ্ভিদ ও প্রাণীর একটি বড়ো অংশ স্থলজ পরিবেশে বসবাস করে। স্থলভাগের উদ্ভিদ হলো আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, কলা, নিম, কড়ই, মেহগনি ইত্যাদি। এসব বড়ো বড়ো উদ্ভিদের নিচে ছায়াযুক্ত স্থান হলো ছোটো ছোটো উদ্ভিদের আবাস, যেমন– বিভিন্ন ধরনের ঘাস বা তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। স্যাঁতস্যাঁতে, ভেজা ও ঠান্ডা স্থানে জন্মে মস ও ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ। কোনো কোনো উদ্ভিদ আবার বড়ো উদ্ভিদের গায়ে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকে, যেমন– অর্কিড ও বিভিন্ন ধরনের ফার্ন। আবার প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে মানুষ, গরু, ছাগল, হাতি, বাঘ, শেয়াল, হাঁস, মুরগি, বিভিন্ন রকমের পাখি, ইঁদুর, কেঁচো, পিঁপড়া ইত্যাদি। স্থলজ আবাসস্থলের মধ্যেও অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে, যেমন– বনজ, মরুজ, তৃণভূমি ইত্যাদি।

বনজ আবাসস্থল: যখন কোনো স্থানে প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে জন্মায় তখন সেখানে বনের সৃষ্টি হয়। যেমন– আমাদের দেশের শালবন, সুন্দরবন। বনের উদ্ভিদসমূহের মধ্যে শাল বা গজারি, মেহগনি, সুন্দরী, গেওয়া, গর্জন অন্যতম। এছাড়াও আছে গুল্ম, তৃণ, মস ও ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ। বনজ পরিবেশে অনেক প্রাণীও বসবাস করে। যেমন– আমাদের সুন্দরবনে বাঘ, হরিণ, বানর, কুমির ও বিভিন্ন ধরনের পাখির আবাসস্থল। ব্যাঙ উভচর প্রাণী, শিশু অবস্থায় (ব্যাঙাচি) এরা পানিতে থাকে। বড়ো হয়ে মাটি ও পানি উভয় স্থানে বসবাস করে। সাপ, ইঁদুর, কাঁকড়া মাটির গর্তে বাস করে। আমাদের দেশে হাতির আবাসস্থল হলো চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি। আমাদের জাতীয় প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগার শুধু সুন্দরবনেই বাস করে।

বনজ পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী

তৃণভূমি: স্থলজ পরিবেশের মধ্যে অনেক স্থানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের প্রাধান্য থাকে। এই ধরনের আবাসকে বলে তৃণভূমি। এখানে থাকে শণ, নলখাগড়া, বীরুৎ ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। প্রাণীদের মধ্যে থাকে হরিণ, কুকুর, খরগোশ, শেয়াল, বাজপাখি, পেঁচা, হায়েনা ইত্যাদি।

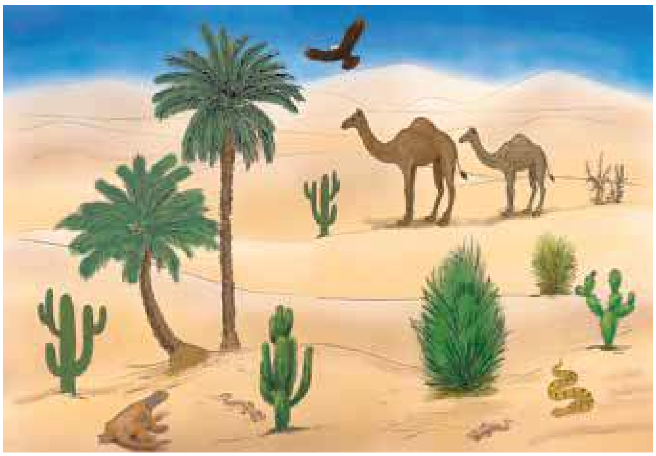

মরুজ পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী

মরুজ আবাসস্থল: মরুভূমি হলো স্থলজ আবাসস্থলের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অঞ্চল। উচ্চ তাপমাত্রা, কম বৃষ্টিপাত, দিন ও রাতের তাপমাত্রার ব্যাপক পার্থক্য এবং শুষ্ক আবহাওয়া মরুজ আবাসস্থলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। খেজুর, ফণীমনসাসহ বিভিন্ন ধরনের ক্যাকটাস ও গুল্ম এই অঞ্চলের উদ্ভিদ। মরুজ আবাসস্থলের প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে উট, গিরগিটি, টিকটিকি, সান্ডা ও বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গ।

মেরু আবাসস্থল: পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে, যেমন- মেরু অঞ্চল। এ অঞ্চলে খুবই কম উদ্ভিদ জন্মে, এদের মধ্যে আছে আর্কটিক উইলো, কটন গ্রাস ও লাইকেন জাতীয় উদ্ভিদ। কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের প্রাণী এ অঞ্চলে বাস করে বাস করে। যেমন- শ্বেত ভল্লুক, সিল, পেঙ্গুইন ইত্যাদি।

মেরু অঞ্চলে প্রাণী

জলজ আবাসস্থল

সারা বছর পানি থাকে এমন আবাসস্থলগুলোই জলজ আবাস স্থল। সমুদ্র, নদী, পুকুর, খাল, বিল, ইত্যাদি হলো জলজ আবাসস্থল। এসব আবাসস্থলের পরিবেশেরও ভিন্নতা রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো স্বাদু পানির জলজ পরিবেশ। যেমন– নদী, পুকুর, খাল, বিল ইত্যাদি। এই পরিবেশে জন্মানো বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে শাপলা, পদ্ম, কচুরিপানা, ক্ষুদিপানা, টোপাপানা ও বিভিন্ন ধরনের শৈবাল।

জলজ পরিবেশে প্রাণী ও উদ্ভিদ

প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে রুই, কাতলা, মৃগেল, পাঙ্গাসসহ অনেক ধরনের মাছ, কুমির, কাছিম, কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক, চিংড়ি ইত্যাদি।

সামুদ্রিক আবাসস্থল: জলজ পরিবেশ হলেও সমুদ্রের পানি নদী, পুকুর, খাল, ও বিলের পানি থেকে আলাদা। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত। এই পানিতে যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে তারা সাধারণত নদী, পুকুর বা খাল বিলে বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীদের থেকে আলাদা। সামুদ্রিক পরিবেশে প্রধান উদ্ভিদ হলো বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক শৈবাল, যেমন- ল্যামিনারিয়া (Laminaria), সারগাসাম

সামুদ্রিক পরিবেশে প্রাণী ও উদ্ভিদ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

(Sargassam)। এছাড়াও সামুদ্রিক ঘাস-এর মধ্যে রয়েছে যস্টেরা (Zostera), হ্যালোডিউল (Halodule) ইত্যাদি। সামুদ্রিক প্রাণীগুলোর মধ্যে রয়েছে তিমি, ডলফিন, অক্টোপাস, হাঙর, লাল কাঁকড়া, তারামাছ, জেলি ফিশসহ অসংখ্য প্রজাতির মাছ। সমুদ্রের লোনা পানির মাছের মধ্যে প্রধান হলো রূপচাঁদা, লইট্যা, লাক্ষা, কোরাল, স্যামন, টুনা, ইলিশ ইত্যাদি

জলাভূমি: কিছু কিছু নিচু এলাকা বছরের বেশির ভাগ সময় জলমগ্ন থাকে, বাকি সময় শুষ্ক থাকে। এদের বলে জলাভূমি। এসব এলাকায় ঋতু অনুযায়ী উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। বাংলাদেশের হাওড়, বাঁওড় এ ধরনের জলাভূমি। এ ধরনের জলাভূমি স্বাদু পানির হতে পারে। যেমন– রাতারগুল, হাকালুকি হাওড় এই ধরনের জলাভূমি। আবার নোনা পানির জলাভূমিও হতে পারে, যেমন– সুন্দরবন। পানির গভীরতার সাথে সাথে এখানে জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তন হয়। এখানকার বিশেষ উদ্ভিদ হলো কলমি, হেলেঞ্চা, হিজল, করচ, বরুন ইত্যাদি। এ পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী যেমন– মাছ, সাপ, ব্যাঙ এবং জলচর পাখি দেখা যায়।

২. জীবের অভিযোজন

নির্দিষ্ট বাসস্থানের বা পরিবেশের সাথে জীবের খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার প্রক্রিয়াকে অভিযোজন বলে। পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। প্রাণীদের মধ্যেও বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ গঠনগত নানারকম পরিবর্তন দেখা যায়।

? বিভিন্ন পরিবেশে জীব কীভাবে নিজেকে খাপ খাওয়ায়?

কাজ: জীবের অভিযোজন কৌশল অনুসন্ধান

যা লাগবে:

১. কচুরিপানা

২. মুরগি ও হাঁসের পায়ের চিত্র

যা করতে হবে

১. কচুরিপানা এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ। এরা পানিতে ভেসে থাকে। কচুরিপানা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি।

২. আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছি এদের কাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে ফাঁপা অংশ থাকে। কচুরিপানায় এই ফাঁপা অংশ থাকার কারণ কী? কচুরিপানায় এই ফাঁপা অংশ থাকা-সম্পর্কিত ধারণা নিচের ফাঁকা জায়গায় লেখো।

৩. বাস্তবে বা ছবিতে মুরগি এবং হাঁসের পায়ের আঙুলের মধ্যে ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করি। এ ভিন্নতার কারণ নিচের খালি জায়গায় লিখে রাখি।

৪. কয়েকটি দল গঠন করে উপরের কাজ দুটো নিয়ে আলোচনা করি।

৫. শ্রেণিতে দলের কাজ উপস্থাপন করি। উপস্থাপনের পর সহপাঠী ও শিক্ষকের মতামতের আলোকে কাজের সংশোধন প্রয়োজন হলে তা লিখে রাখি।

সারসংক্ষেপ

কচুরিপানার মধ্যে যে ফাঁপা অংশ থাকে তাকে বায়ুকুঠুরি বলে। এই বায়ুকুঠুরি কচুরিপানাকে জলজ পরিবেশে ভেসে থাকতে সাহায্য করে। বায়ুকুঠুরি জলজ পরিবেশে উদ্ভিদের একটি অভিযোজন। মুরগির পা-গুলো শক্ত, লম্বা এবং শক্ত নখরযুক্ত হয়। ফলে মুরগি মাটি খুঁড়ে পোকা বের করে খেতে পারে। হাঁসের পা-গুলো পাতার মতো পর্দাবিশিষ্ট। এতে হাঁস সহজে পানিতে সাঁতার কাটতে পারে।

কচুরিপানা

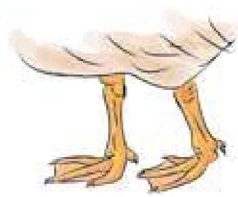
হাঁসের পা

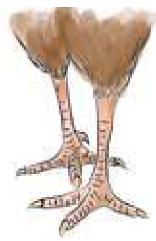
মুরগির পা

জীবের অভিযোজন সম্পর্কে আরও কিছু জানি

কোনো জীব যে নির্দিষ্ট পরিবেশে বসবাস করে সেই পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য নিজের গঠন ও শরীরবৃত্তীয় কাজের পরিবর্তন ঘটায়। একে অভিযোজন বলে। মূলত বাসস্থান, আত্মরক্ষা, প্রজনন বা বংশবৃদ্ধির জন্য জীবে এসব পরিবর্তন ঘটে থাকে।

স্থলজ পরিবেশ

স্থলজ আবাসস্থলের মধ্যে প্রধান হলো **বনজ পরিবেশ**। এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে। এদের কাণ্ড শক্ত ও মোটা এবং শাখা-প্রশাখা যুক্ত। এদের মূলও মোটা, শক্ত ও বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা যুক্ত। ফলে এরা কাণ্ডকে দৃঢ়ভাবে মাটির সাথে আটকে রাখতে পারে। শীতকালে বায়ু শুষ্ক থাকায় উদ্ভিদের পাতার মাধ্যমে পানি বের হয়ে যাওয়ার পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। এতে পানিশূন্য হয়ে উদ্ভিদের মৃত্যু হতে পারে। এরকম বিপদ হতে রক্ষা পেতে কোনো কোনো উদ্ভিদ শীতকালে পাতা ঝরিয়ে ফেলে।

শিকারি প্রাণীর অভিযোজন (তীক্ষ্ণ ঠোঁট, ধারালো নখর ও দাঁত)

বনজ পরিবেশের প্রাণীদের শ্বাসকার্য চালানোর জন্য শক্তিশালী ফুসফুস থাকে। দ্রুত ও দীর্ঘ পথ চলাচলের জন্য এদের পা অনেক শক্তিশালী হয়। শিকার ধরা ও মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য এদের তীক্ষ্ণ-ধারালো নখ ও দাঁত থাকে। বনজ পরিবেশের অন্যতম প্রাণী হলো পাখি। পাখিরা মূলত আকাশচারী। এদের ডানা আছে, হাড়ে মজ্জা কম থাকায় দেহ হালকা হয়। আবার দেহে বায়ুভর্তি থলি থাকে, যা উড়তে সহায়তা করে। শিকারি পাখি যেমন ঈগলের শিকার ধরার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি, ধারালো বড়শির মতো বাঁকানো ঠোঁট, নখরযুক্ত পা এবং শক্তিশালী ডানা রয়েছে। বনের কিছু প্রাণী যেমন– গিরগিটি ও প্রজাপতি যে পরিবেশে বাস করে আত্মরক্ষার জন্য সেই পরিবেশের বর্ণ ধারণ করতে পারে।

মরুজ পরিবেশের কম বৃষ্টিপাত এবং উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে উদ্ভিদগুলো ছোটো ছোটো ঝোপঝাড়ের মতো হয়। পানি জমা করে রাখার জন্য এসব গাছের পাতা ও কাণ্ড মোটা, চ্যাপ্টা এবং রসালো হয়। আত্মরক্ষার জন্য কোনো কোনো গাছের পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। যেমন– বিভিন্ন ধরনের ক্যাকটাস, খেজুর ইত্যাদি। মরুজ পরিবেশের প্রাণীরা শরীরে পানি ও খাদ্য সঞ্চয় করে রাখতে পারে। যেমন– উট। সূর্যতাপ থেকে বাঁচার জন্য ছোটো ছোটো প্রাণীরা মাটির নিচে গর্ত করে বসবাস করে।

মরুভূমির উদ্ভিদ

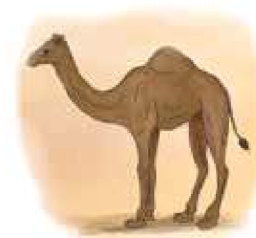

মরুভূমির প্রাণী

স্থলজ পরিবেশের **মেরু অঞ্চল** বরফে ঢাকা থাকে। এরূপ পরিবেশে খুবই কম উদ্ভিদ জন্মে। এরা তীব্র ঠান্ডা সহ্য করতে পারে। এখানে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের প্রাণী বাস করে। তীব্র ঠান্ডায় উষ্ণ থাকার জন্য এসব প্রাণীদের শরীরের চামড়ার নিচে পুরু চর্বির স্তর থাকে। এদের অধিকাংশই বরফের মতো সাদা লোমযুক্ত হওয়ায় সহজেই লুকিয়ে থেকে আত্মরক্ষা ও শিকার করতে পারে। এদের লম্বা, বাঁকানো এবং শক্তিশালী পা বরফে চলার জন্য অভিযোজিত হয়।

মেরু অঞ্চলের প্রাণী

জলজ পরিবেশ

জলজ পরিবেশে পানির ঢেউয়ের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য উদ্ভিদের দেহ নরম হয় ও মূল সংক্ষিপ্ত হয়। ভেসে থাকার জন্য প্রচুর বায়ু-কুঠুরি থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অঙ্গজ বংশবৃদ্ধি করে।

পানির ঢেউয়ের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য মাছের দেহের মধ্যভাগ চ্যাপ্টা এবং মাথা ও লেজের দিকে সরু হয়। পানিতে ভেসে থাকা ও চলাচলের জন্য এদের দেহে বায়ুথলি বা পটকা থাকে। পাখনা ও লেজ এদের সাঁতার কাটতে সাহায্য করে। এরা ফুলকা দিয়ে পানিতে থাকা অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্য চালায়।

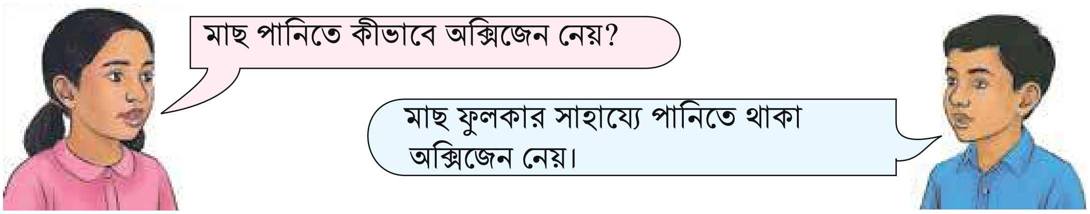

জলজ পরিবেশের সবচেয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল হলো **সামুদ্রিক পরিবেশ**। এই পরিবেশে পানির লবণাক্ততা ও পানির প্রবল চাপ মোকাবেলার জন্য জীবের অভিযোজন ঘটে। বিভিন্ন ধরনের ভাসমান শৈবালই এই পরিবেশের প্রধান উদ্ভিদ। সামুদ্রিক মাছেরও মাথা ও লেজের দিকে সরু এবং মধ্যভাগ চওড়া হয়। পাখনা ও লেজ সাঁতার কাটতে সাহায্য করে। সামুদ্রিক মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ফুসফুস দীর্ঘ সময় ধরে বাতাস জমা রাখে। শিকার ও আত্মরক্ষার জন্য এরা আলো, রং ও বিষাক্ত তরল ব্যবহার করতে পারে।

জলাভূমি পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে স্থলজ ও জলজ উভয় ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। উদ্ভিদের পাতা পাতলা ও প্রশস্ত এবং মূল জলজ উদ্ভিদের চেয়ে শক্তিশালী। জলমগ্ন অবস্থায় শ্বাসকার্য চালানোর জন্য শ্বাসমূল (Pneumatophore) বের হয়। জলাভূমি যখন পানিতে পূর্ণ থাকে তখন সেখানে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর আধিক্য দেখা যায়। পানি কমে গেলে কিছু কিছু প্রাণী অল্প পানিতে বা কাদার মধ্যে লুকিয়ে থেকে আত্মরক্ষা করে।

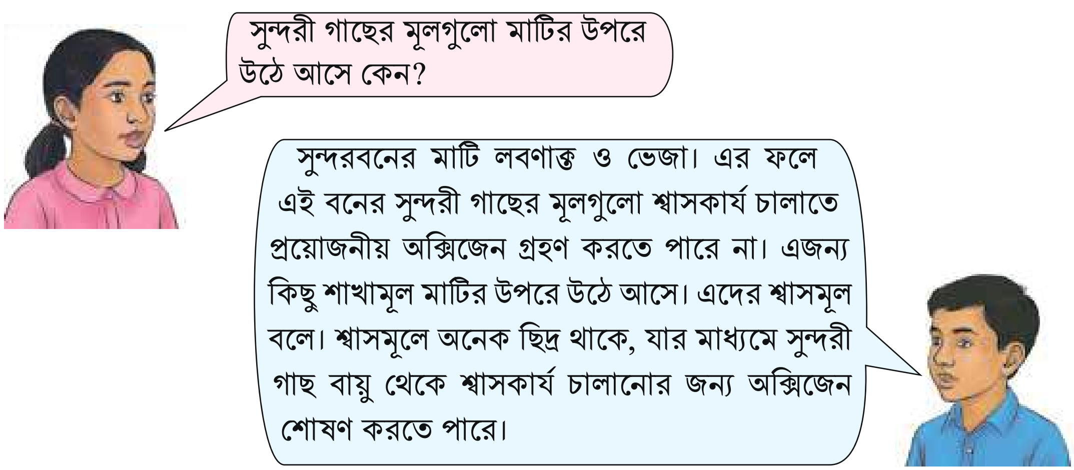

কাজ: জীবের বাসস্থান ও অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা

নিচের ছকে কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম দেওয়া আছে। এরা কোন পরিবেশে বাস করে এবং এদের কোন কোন বৈশিষ্ট্য উক্ত পরিবেশে টিকে থাকতে সহায়তা করে তা নিচের ছকে লেখো।

কয়েকজন সহপাঠীর সাথে ছকটি মিলিয়ে নিই ও আলোচনা করি। প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নিই।

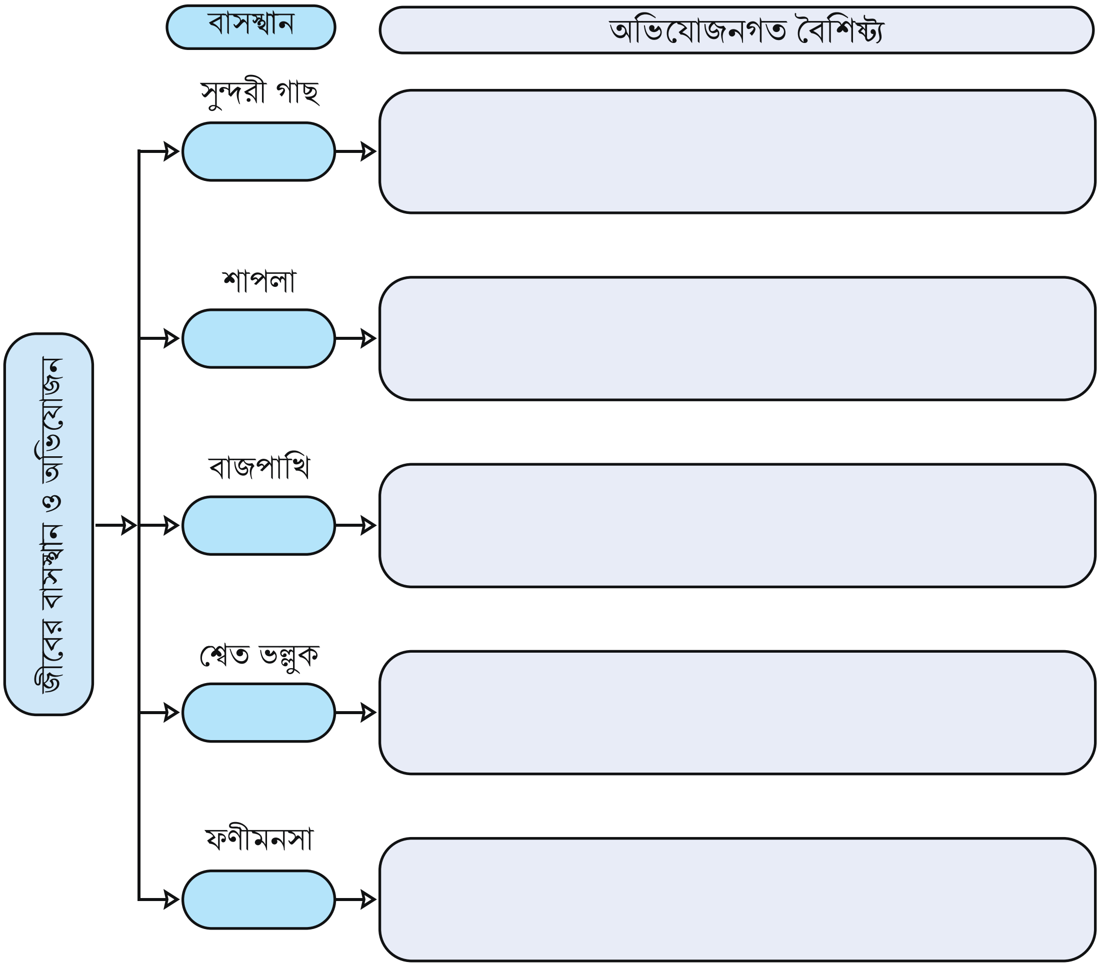

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দিই

ক) জলজ উদ্ভিদের অনন্য বৈশিষ্ট্য কোনটি?

☐ পাতা পুরু ☐ বায়ুকুঠুরি ☐ ফুল ☐ কাঁটাযুক্ত

খ) মাংসাশী প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?

☐ দ্রুত গতি ☐ বড়ো আকৃতি ☐ তীক্ষ্ণ দাঁত ☐ চর্বির স্তর

গ) শ্বাসমূল কোন উদ্ভিদে পাওয়া যায়?

☐ হিজল ☐ সুন্দরী ☐ পাকুড় ☐ কচুরিপানা

২. শূন্যস্থান পূরণ

নিচের শব্দগুলো থেকে সঠিক শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি

[বায়ুথলি, চর্বিস্তর, ফার্ন, বায়ুকুঠুরি, মাছ]

ক) জলজ উদ্ভিদকে পানিতে ভেসে থাকতে সাহায্য করে ....।

খ) তীব্র ঠান্ডায় প্রাণীর দেহকে গরম রাখে ....।

গ) ছায়াযুক্ত স্থানের একটি উদ্ভিদ হলো ....।

৩. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

ক) জীবের আবাসস্থল বলতে কী বুঝায়?

খ) স্বাদু পানির পরিবেশে কী ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ থাকে?

গ) জলজ প্রাণীতে কী ধরনের অভিযোজন ঘটে?

৪. বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন:

ক) স্থলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

খ) জলজ পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করি।

গ) সামুদ্রিক পরিবেশের প্রাণীদের অভিযোজনের ক্ষেত্রগুলো কী কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করি।

অধ্যায় ২

জীব ও পরিবেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

আমরা আগেই জেনেছি পরিবেশের উপাদানগুলো জীব ও জড় এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মানুষ, পশু-পাখি, গাছপালা এরা হলো জীব। মাটি, পানি, বায়ু, সূর্য, গাড়ি, চেয়ার, টেবিল, খেলনা ইত্যাদি হলো জড়। এদের মধ্যে মাটি, পানি, বায়ু ও সূর্য হলো পরিবেশের মৌলিক জড় উপাদান। জীব ও জড় উপাদানসমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

১. জড়বস্তুর ওপর জীবের নির্ভরশীলতা

জড়বস্তু ও জীব নিয়ে আমাদের পরিবেশ। পরিবেশে জড় বস্তু বলতে আমরা মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদিকে বুঝি। বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি জীব কোনো না কোনোভাবে এসব জড় বস্তুর ওপর নির্ভরশীল।

জীব কীভাবে জড়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল?

কাজ: জড়বস্তুর ওপর জীবের নির্ভরশীলতা খুঁজে বের করা

যা করতে হবে:

১. আমরা বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের যে সকল জড়বস্তুর ওপর নির্ভর করি তাদের নাম নিচের ছকে দেওয়া আছে। এই জড়বস্তুগুলো কী কাজে ব্যবহার হয় তা খুঁজে বের করে নিচের ছক পূরণ করি। উদাহরণ হিসেবে একটির ব্যবহার দেওয়া আছে।

জড়বস্তু	কী কাজে ব্যবহার হয়
পানি	পান করা, গোসল করা, চাষাবাদ করা
বায়ু	
সূর্য	
মাটি	

২. ছকে আমরা যা লিখেছি তা নিয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করি এবং নতুন কোনো ধারণা পেলে তা লিখে রাখি। এ সময় শিক্ষকের সহায়তায় নিই।

সারসংক্ষেপ

আমরা সর্বদা জড়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। আমাদের শ্বাসকার্য চালানোর জন্য বায়ুর প্রয়োজন। পানি ছাড়া আমাদের জীবন অচল। মাটি থেকে আমরা খাদ্যশস্য পাই। এছাড়াও আমাদের প্রয়োজনে ঘরবাড়ি,

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

আসবাবপত্র, পোশাক, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈরিতে জড়বস্তু ব্যবহার করি। এভাবে আমরা বিভিন্ন কাজে প্রতিনিয়ত জড়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। বেঁচে থাকা, বংশবৃদ্ধি এবং প্রকৃতিতে টিকে থাকার জন্য মানুষ জড়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল।

জড়বস্তুর উপর জীবের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে আরও কিছু জানি

আমাদের পরিবেশ

প্রাণীর নির্ভরশীলতা

মানুষের মতো অন্যান্য সকল প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য বায়ু, মাটি, পানি ইত্যাদি জড়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। মাটি এবং পানি অনেক জীবের বাসস্থান। অনেক পোকামাকড়, কেঁচো, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণী মাটির নিচে বাস করে। মাছ, কুমির, কাছিম ইত্যাদি পানিতে বাস করে। বায়ুতে যে অক্সিজেন রয়েছে প্রাণীরা তা দিয়ে শ্বাসকার্য চালায়।

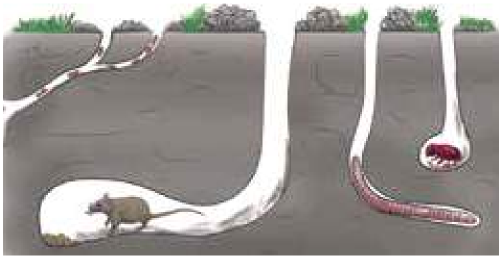

মাটির নিচে প্রাণীর বসবাস

উদ্ভিদের নির্ভরশীলতা

প্রাণীদের মতো উদ্ভিদও জড়বস্তুর ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। প্রাণীর মতো উদ্ভিদেরও শ্বাসকার্যের জন্য বায়ুর অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদ সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি ব্যবহার করে নিজের খাদ্য তৈরি করে। অধিকাংশ সবুজ উদ্ভিদের দেহে (৭০-৯০)% পানি থাকে। মাটিতে উদ্ভিদের জন্য যে পুষ্টি উপাদানগুলো থাকে তা পানির মাধ্যমেই উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছায়। শাপলা, কচুরিপানা, টোপাপানা প্রভৃতি উদ্ভিদের আবাসস্থল হলো পানি।

২. উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

প্রকৃতিতে উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। তাদের এই পারস্পরিক নির্ভরতা ও প্রকৃতির ভারসাম্য ও সৌন্দর্য রক্ষা করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর নির্ভরতা

? উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল?

কাজ: উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা খুঁজে বের করা।

যা করতে হবে:

১. উপরের চিত্রটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি।

২. চিত্র অনুযায়ী উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে লেখো।

উদ্ভিদের ওপর প্রাণীর নির্ভরশীলতা	প্রাণীর ওপর উদ্ভিদের নির্ভরশীলতা

সারসংক্ষেপ

উদ্ভিদ ও প্রাণী কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। পরিবেশে বসবাস এবং বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদানের চাহিদা পূরণের জন্য তারা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে আরও কিছু জানি

পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অন্যের পরিপূরক। প্রাণী শ্বাসক্রিয়ায় যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে, উদ্ভিদ তা ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। প্রাণী এই খাদ্য গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণে যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তা প্রাণী শ্বাসগ্রহণের সময় ব্যবহার করে।

সালোকসংশ্লেষণ

উদ্ভিদ অনেক প্রাণীর আবাসস্থল। যেমন– গাছের ডালে পাখি, বানর, মৌমাছি, পিঁপড়া ইত্যাদি বাস করে। উদ্ভিদের পরাগায়ন ও বীজের বিস্তরণ প্রাণীদের ওপর নির্ভরশীল। মৌমাছি, পাখি, প্রজাপতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ফুলে ফুলে ঘুরে মধু সংগ্রহ করে। এদের মাধ্যমে এক ফুলের পরাগরেণু অন্য ফুলে স্থানান্তরিত হয়ে পরাগায়ন ঘটায়। পরাগায়ন না হলে অধিকাংশ উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি সম্ভব হবে না।

ফুলে পরাগায়ন

পাখিরা ফল খায়। ফল খাওয়ার সময় পাখির মাধ্যমে প্রকৃতিতে ফলের বীজ ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বীজের বিস্তরণ ঘটে। কিছু কিছু উদ্ভিদের বীজের সরাসরি অঙ্কুরোদ্গম হয় না। এসব উদ্ভিদের বীজ পাখি খাওয়ার পর তার মলের মাধ্যমে আবার মাটিতে ফিরে আসে। তারপর সেগুলো থেকে উদ্ভিদের নতুন চারাগাছ জন্ম নেয়। যেমন–বট, পাকুর প্রভৃতি উদ্ভিদ।

বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ পচে প্রকৃতিতে জড় উপাদানে পরিণত হয়। সবুজ উদ্ভিদ এদেরকে পুষ্টি উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে। এভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে পরিবেশে গতিশীলতা ও ভারসাম্য বজায় থাকে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

৩. উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল তা জেনেছি। এখন আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে জানব।

? উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ কীভাবে পরস্পর নির্ভরশীল?

কাজ: উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা খুঁজে বের করা

যা করতে হবে:

১. ধারণাচিত্রটির ফাঁকা স্থানে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে লেখো।

উদ্ভিদের ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা	প্রাণীর ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা	মানুষের ওপর উদ্ভিদ ও প্রাণীর নির্ভরশীলতা

সারসংক্ষেপ

বেঁচে থাকার জন্য মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর নির্ভর করে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্ভিদ ও প্রাণীও বংশবৃদ্ধি এবং টিকে থাকার জন্য মানুষের ওপর নির্ভরশীল।

উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে আরও কিছু জানি

উদ্ভিদের ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা

আমরা প্রতিদিন যে খাবারগুলো খাই তার অধিকাংশ উদ্ভিদ থেকে আসে। এগুলো হলো ভাত, আটা, ময়দা, ডাল, ফলমূল, শাকসবজি, বীজ ইত্যাদি। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যে অক্সিজেন উৎপন্ন করে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী সেই অক্সিজেন গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। উদ্ভিদ থেকে অনেক ধরনের ওষুধ তৈরি হয়। মানুষের ঘরবাড়ি আসবাবপত্র তৈরি উদ্ভিদের কাঠ ব্যবহার করা হয়।

প্রাণীর ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা

আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় যে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম থাকে সেগুলো আমরা প্রাণী থেকে পাই। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যেমন– পোশাক, ব্যাগ, জুতা, চিরুনি ইত্যাদি প্রাণীর চামড়া, পশম ও হাড় থেকে তৈরি হয়। প্রাণীর হাড়ের গুঁড়ো থেকে সার তৈরি হয়। এই সার মানুষ ফসল ফলাতে ব্যবহার করে। এছাড়াও আমরা বাড়িতে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি লালনপালন করি। এগুলো থেকে আমরা যেমন খাদ্য পাই তেমনি অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হই।

উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে প্রাপ্ত সামগ্রী

মানুষের ওপর উদ্ভিদ ও প্রাণীর নির্ভরশীলতা

মানুষ প্রাণী ও উদ্ভিদের ওপর নানাভাবে নির্ভরশীল। আবার প্রাণী ও উদ্ভিদ অনেক ক্ষেত্রে মানুষের ওপর নির্ভরশীল। যেমন– মানুষ যখন পশুপালন করে তখন প্রাণীর খাদ্য সরবরাহ করে। বংশবৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। সুস্থতার জন্য উন্নত পরিবেশ ও চিকিৎসা নিশ্চিত করে।

মানুষ চাষাবাদের মাধ্যমে উদ্ভিদের ফসল ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। সার ব্যবহার করে উদ্ভিদের পুষ্টি সরবরাহ করে। রোগ, আগাছা ও প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে রক্ষা করে। বনায়নের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি ও উদ্ভিদ প্রজাতির টিকে থাকা নিশ্চিত করে।

৪. খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্যজাল

জীবনের জন্য সকল জীবের খাদ্য প্রয়োজন। প্রাণী ও উদ্ভিদ খাদ্যের জন্য একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতিতে কোনো কোনো প্রাণী ঘাস, লতাপাতা, ফল ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে। আবার কোনো প্রাণী অন্য প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। যেসকল প্রাণী অন্য প্রাণী বা উদ্ভিদকে খায় তারা হলো খাদক। আর যেসকল জিনিস খাওয়া হয় অর্থাৎ যা খেয়ে প্রাণী জীবন ধারণ করে তাকে খাদ্য বলে।

খাদ্য গ্রহণের বিবেচনায় প্রাণী ও উদ্ভিদ কীভাবে সম্পর্কযুক্ত?

কাজ: খাদক ও খাদ্য নির্বাচন

যা করতে হবে:

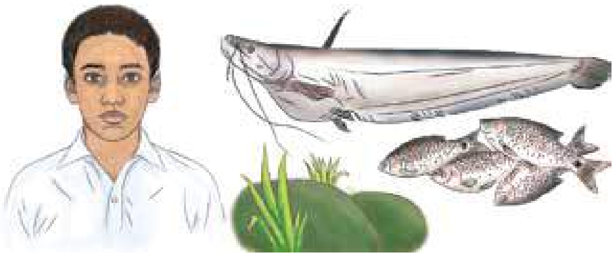

চিত্রের জীবগুলোর খাদ্য ও খাদকের সম্পর্ক নিয়ে দলে আলোচনা করি। আলোচনা শেষে প্রবাহচিত্রের ঘরগুলো পূরণ করি।

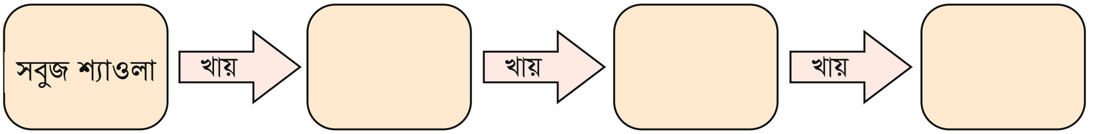

সারসংক্ষেপ

খাদ্য এবং খাদকের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে খাদ্যশৃঙ্খল তৈরি হয়। উপরের প্রবাহচিত্রটিতে দেখা যায়, পরিবেশের জীবগুলো খাদ্য গ্রহণের বিবেচনায় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একটি খাদক অন্য প্রাণীর কাছে খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সম্পর্কটিই খাদ্যশৃঙ্খল হিসেবে পরিচিত।

খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্যজালের সম্পর্কে আরও কিছু জানি

খাদ্যশৃঙ্খল

বেঁচে থাকার জন্য জীবের শক্তি প্রয়োজন হয়। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী খাদ্য থেকে এই শক্তি পায়। খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে এই শক্তি বিভিন্ন প্রাণীতে স্থানান্তরিত হয়। খাদ্য এবং খাদকের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে এদেরকে উৎপাদক ও খাদক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

উৎপাদক

সবুজ উদ্ভিদ সূর্যের আলো ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিজের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করতে পারে। সবুজ উদ্ভিদকে উৎপাদক বলা হয়।

খাদক

প্রাণীরা নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না। সবুজ উদ্ভিদ এবং তাদের তৈরিকৃত খাদ্যের ওপর প্রাণীরা নির্ভরশীল। এজন্য প্রাণীদের বলা হয় খাদক। যে সকল প্রাণী সরাসরি উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তারা হলো প্রথম স্তরের খাদক। যেমন–ঘাসফড়িং, গরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি। যে সকল প্রাণী তৃণভোজী প্রাণীদের খেয়ে বেঁচে থাকে, তারা হলো দ্বিতীয় স্তরের খাদক, যেমন–ব্যাঙ, শিয়াল

ইত্যাদি প্রাণী। আবার দ্বিতীয় স্তরের খাদককে যারা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, তারা হলো তৃতীয় স্তরের খাদক, যেমন– সাপ, ঈগল, বাঘ ইত্যাদি। অধিকাংশ তৃতীয় স্তরের খাদক মাংসভোজী। খাদ্যশৃঙ্খলের প্রতিটি স্তরকে খাদ্যস্তর (Trophic level) বলে।

খাদ্যজাল

কোনো বাস্তুসংস্থানে বিদ্যমান একাধিক খাদ্যশৃঙ্খল খাদ্য-খাদক সম্পর্কের ভিত্তিতে একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে। খাদ্যশৃঙ্খলসমূহ পরস্পর যুক্ত হয়ে জালের মতো জটিল যে অবস্থা তৈরি করে, তাকে খাদ্যজাল বলে।

খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্যজালের মাধ্যমে একই পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন জীবের মধ্যে শক্তি ও খাদ্যের ভারসাম্য বজায় থাকে।

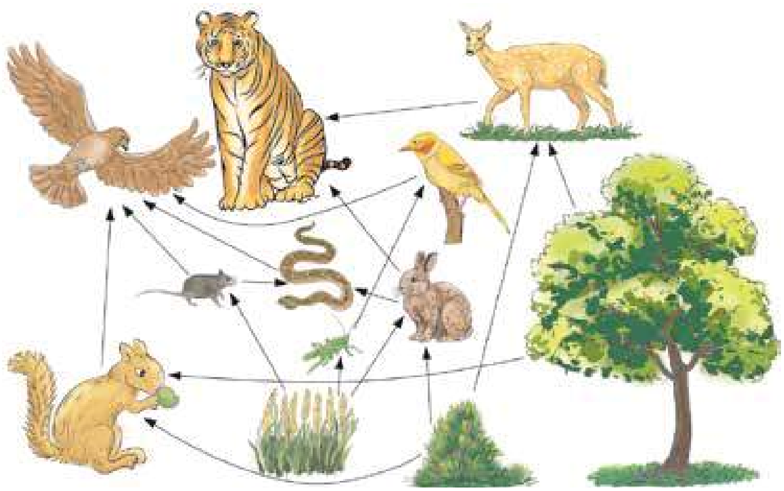

খাদ্যজাল

৫. শক্তি প্রবাহ

শক্তির প্রধান উৎস সূর্য। এ থেকে সৌরশক্তি বিভিন্ন জীবে সঞ্চারিত হয়। এই শক্তি কীভাবে এক জীব থেকে অন্য জীবে সঞ্চারিত হয় তা নিয়ে আমরা কাজ করব।

প্রকৃতিতে জীব কোথা থেকে শক্তি পায়?

কাজ: শক্তি কীভাবে প্রবাহিত হয়, তা খুঁজে বের করা

যা করতে হবে:

১. উপরের চিত্রটি ভালোভাবে লক্ষ করি।

২. সূর্য থেকে শক্তি বিভিন্ন জীবে কীভাবে স্থানান্তর হয় তা খুঁজে বের করি।

৩. সূর্য থেকে শক্তি প্রথমে কোন জীবে স্থানান্তরিত হয়, পরবর্তী সময় তা কীভাবে অন্য জীবে স্থানান্তরিত হয়; নিচের প্রবাহচিত্রের ফাঁকা জায়গায় লেখো।

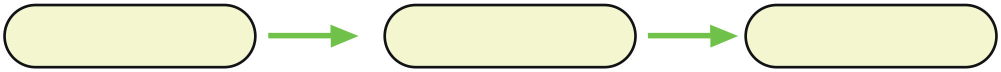

পূরণকৃত প্রবাহচিত্রটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি। প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নিই।

সারসংক্ষেপ

উদ্ভিদ প্রত্যক্ষভাবে ও প্রাণী পরোক্ষভাবে সূর্য থেকে শক্তি নিয়ে বেঁচে থাকে।

শক্তি প্রবাহ সম্পর্কে আরও কিছু জানি

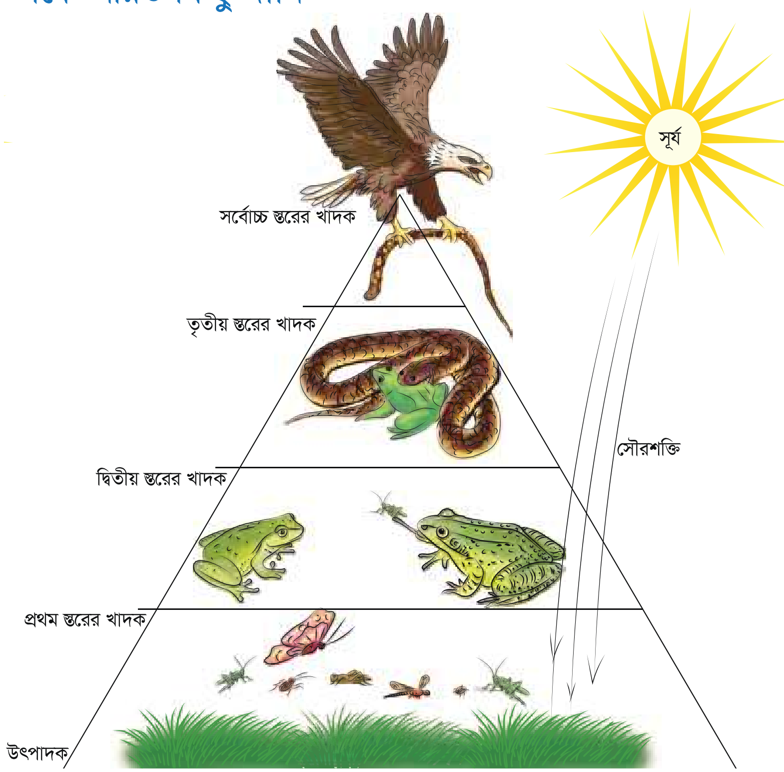

উদ্ভিদ ও প্রাণীতে শক্তি প্রবাহ

পৃথিবীর সকল শক্তির উৎস হলো সূর্য। একে সৌরশক্তি বলে। এই সৌরশক্তি সবুজ উদ্ভিদ বা উৎপাদকের দেহে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে আবদ্ধ বা জমা হয়। উৎপাদক বা সবুজ উদ্ভিদে এই শক্তি খাদ্য হিসেবে থাকে। প্রথম স্তরের খাদক সবুজ উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে উদ্ভিদের শক্তি প্রথম স্তরের খাদকে প্রবাহিত হয়। এভাবে শক্তি পর্যায়ক্রমে প্রথম স্তরের খাদক হতে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্তরের খাদকে পৌঁছে। এভাবে শক্তির প্রবাহ চলতে থাকে। একেই বাস্তুসংস্থানে শক্তির প্রবাহ বলা হয়। খাদ্যস্তরের বিভিন্ন জীব এই শক্তি কাজে লাগিয়ে চলাফেরাসহ অন্যান্য কাজ করে। শক্তির এই প্রবাহ একমুখী।

৬. পরিবেশের সকল উপাদানের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

পরিবেশের উপাদান হচ্ছে মাটি, পানি, বায়ু, আলো, তাপ, উদ্ভিদ ও প্রাণী। এ উপাদানগুলো জীবের আহার ও আশ্রয় জুগিয়ে থাকে। এই উপাদানগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক উপাদান বিলুপ্ত হলে বা হ্রাস-বৃদ্ধি হলে পরিবেশে ভারসাম্য নষ্ট হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য জড় পদার্থ ও জীবের পারস্পরিক ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন।

? পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন কেন?

কাজ: পরিবেশে বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজনীয়তা অনুসন্ধান করা

যা করতে হবে:

১. মনে করি, আমাদের দেশের গড় তাপমাত্রা মারাত্মকভাবে বেড়ে গেল। এর ফলে কী কী সমস্যা তৈরি হতে পারে তা নিচের ধারণাচিত্রের খালি জায়গায় লেখো।

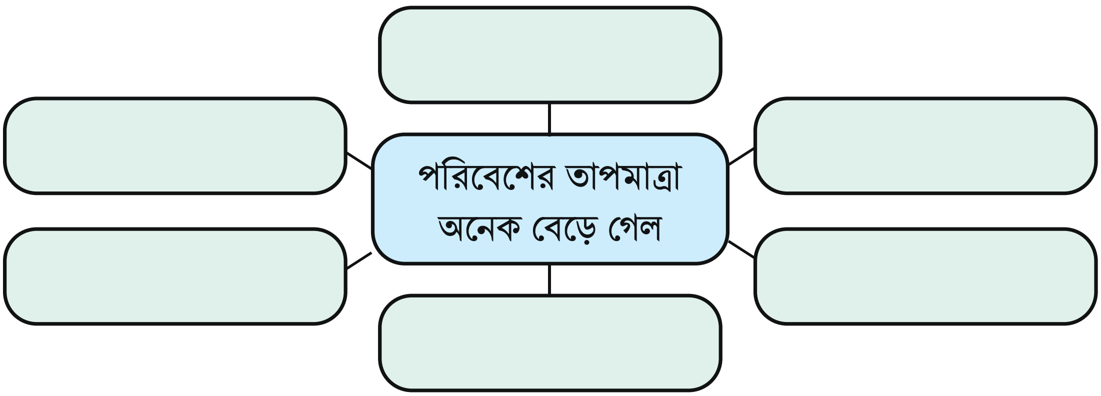

সারসংক্ষেপ

আলো, বায়ু, মাটি, পানি, উদ্ভিদ, প্রাণী প্রভৃতি আমাদের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক। এ উপাদানগুলো আমরা পরিবেশ থেকে পেয়ে থাকি। পরিবেশের যেকোনো একটি উপাদানের অভাব হলে, দূষণ হলে ও পরিবর্তিত হলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

পরিবেশের উপাদানের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরও কিছু জানি

আমরা আগেই জেনেছি, পরিবেশে জীব ও জড়বস্তুর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতিতে জীব ও জড় উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলেই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। তাই পরিবেশের একটি উপাদানের ভারসাম্য নষ্ট হলে জলবায়ু পরিবর্তন, খরা, ফসলহানি, খাদ্যজাল ধ্বংস প্রভৃতি ঘটে থাকে। ফলে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে এবং সমগ্র জীবজগতের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। তাই মানুষ ও জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই পরিবেশের উপাদানগুলোর ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজন।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দিই

ক) জীবজগতে সকল শক্তির উৎস কী?

☐ সূর্য ☐ সবুজ উদ্ভিদ ☐ খাদ্য ☐ বায়ু

খ) নিচের কোন উপাদানের জন্য উদ্ভিদ প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল?

☐ অক্সিজেন ☐ কার্বন ডাইঅক্সাইড ☐ পানি ☐ বংশবৃদ্ধি

গ) খাদ্যশৃঙ্খলে উৎপাদক কোনটি?

☐ ছত্রাক ☐ সবুজ উদ্ভিদ ☐ পশুর খামার ☐ কলকারখানা

২. শূন্যস্থান পূরণ

নিচের শব্দগুলো থেকে সঠিক শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি

[পাখি, উৎপাদক, তৃণভোজী, মাছ, মৌমাছি]

ক) খাদ্যশৃঙ্খলে সবুজ উদ্ভিদকে বলা হয় ....।

খ) .... প্রাণী হলো প্রথম শ্রেণির খাদক।

গ) উদ্ভিদের বীজের বিস্তরণে সাহায্য করে ....।

৩. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক) উদ্ভিদ কীভাবে জড়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল?

খ) উদ্ভিদ বংশবৃদ্ধির জন্য প্রাণীর ওপর কীভাবে নির্ভরশীল?

গ) নিকট-পরিবেশে দেখা যায় এমন একটি খাদ্যশৃঙ্খলের প্রবাহচিত্র তৈরি করি।

৪. বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক) উদ্ভিদের ওপর মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী কীভাবে নির্ভরশীল?

খ) পরিবেশের উপাদানগুলোর ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন কেন?

গ) প্রাণী ও উদ্ভিদের পারস্পরিক নির্ভরতার আলোকে জীবজগতে শক্তির প্রবাহ বর্ণনা করি।

অধ্যায় ৩

খাদ্য

খাদ্য আমাদের দেহে শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন এবং রোগ প্রতিরোধের সক্ষমতা তৈরি করে। আমরা যেসকল খাবার খাই তার সবই কি পুষ্টিসমৃদ্ধ? স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখার জন্য ব্যক্তির বয়স, দৈহিক গড়ন বা কাজের ধরন ইত্যাদি অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। গৃহীত খাদ্যে পরিমিত পরিমাণে শর্করা, প্রোটিন, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ ও পানি উপস্থিত থাকতে হয়। অনেক খাদ্য সহজে নষ্ট হয়ে যায়, ফলে খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। খাদ্যের মান, সতেজতা ও গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ রেখে সারা বছর ব্যবহার-উপযোগী রাখার জন্য আমরা খাদ্য সংরক্ষণ করি।

১. সুষম খাদ্য

যেসব খাবারে পরিমিত পরিমাণে শর্করা, প্রোটিন, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ ও পানি উপস্থিত থাকে, তাই সুষম খাদ্য। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় শর্করা, আমিষ ও চর্বি জাতীয় খাদ্য হিসেবে ভাত, রুটি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, তেল, বাদাম ইত্যাদি থাকে। এর সাথে ভিটামিন ও খনিজ লবণের উৎস হিসেবে পর্যাপ্ত শাকসবজি ও ফলমূল থাকতে হয়।

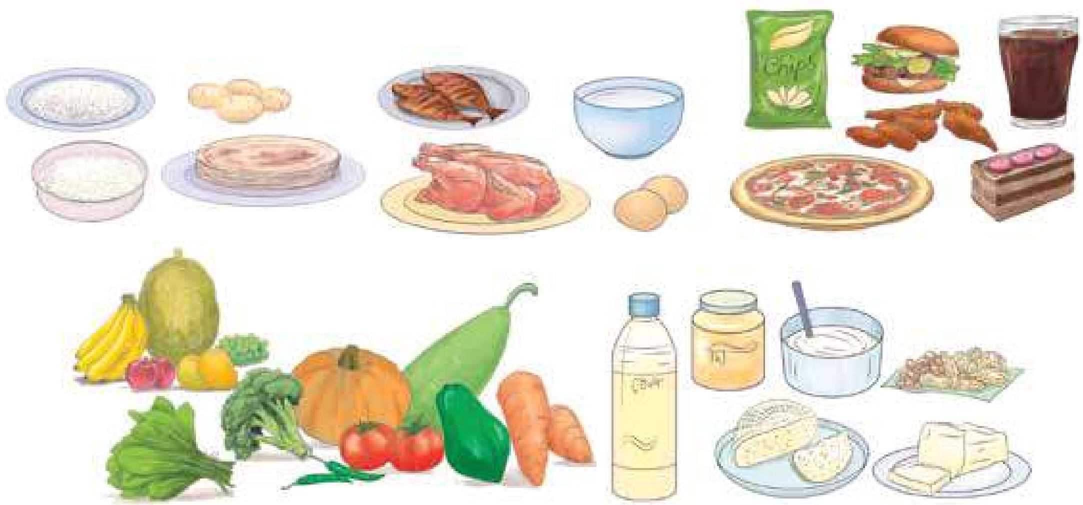

বিভিন্ন প্রকার খাদ্য

আমরা কি সুষম খাদ্য খাই?

কাজ: সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরি

যা করতে হবে:

১. উপরের চিত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করি।

২. সুষম খাদ্যের তালিকায় কী কী খাদ্য থাকতে পারে তা খাদ্যদল অনুযায়ী সাজাই।

৩. সেসব খাদ্য থেকে প্রতিদিন নিজে কী খাই তাও চিহ্নিত করি।

খাদ্যদল	খাদ্যের নাম	নিজে কী খাই
শর্করা		
আমিষ		
স্নেহ বা চর্বি		
ভিটামিন, খনিজ লবণ		

৪. তালিকা দেখে আমার খাবার সুষম কি না তা ভেবে বের করি। সুষম না হয়ে থাকলে কোন খাবার যোগ করলে সুষম হতো তা চিহ্নিত করি।

সারসংক্ষেপ

যথাযথ দৈহিক বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য আমাদের প্রতিদিনের খাবারে শর্করা, আমিষ, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকা প্রয়োজন। এজন্য আমাদের সচেতনভাবে খাদ্য নির্বাচন করতে হবে যাতে আমাদের প্রতিদিনের খাবার সুষম হয়।

সুষম খাদ্যের তালিকা সম্পর্কে আরও কিছু জানি

আমরা তৃতীয় শ্রেণিতে সুষম খাদ্য, খাদ্যদল ও খাদ্যদলের খাদ্যসমূহ আমাদের শরীরে কী কাজে লাগে তা জেনেছি। শিশু, গর্ভবতী মা ও বয়স্ক ব্যক্তির পুষ্টি চাহিদার ভিন্নতা আছে। শিশুরা ধীরে ধীরে বড়ো হয়। এদের বাড়ন্ত শরীরের জন্য শরীর গঠন করে, শক্তি দেয়, রোগ প্রতিরোধ করে এমন খাদ্যের প্রয়োজন। তাই তাঁদের খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন ধরনের আমিষ যেমন– ডিম, মাছ, মাংস, দুধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্য বেশি করে রাখতে হবে।

নিচে শিশুদের (৬ থেকে ১২ বছর) জন্য সুষম খাদ্যের তালিকার নমুনা পরিমাণসহ দেওয়া হলো–

খাদ্য দল	খাদ্যের উৎস	পরিমাণ	
শর্করা	রুটি/পরোটা/পাউরুটি	১-২টা	১৫০ গ্রাম
	ভাত/আলু/নুডুলস	১ কাপ	৫০ গ্রাম
আমিষ	মাংস/মাছ	১-৩ টুকরা	৬০ গ্রাম
	ডিম	১টা	
	ডাল	১-৩ কাপ	
দুগ্ধজাত খাদ্য	দুধ/দই	১ গ্লাস	
	পনির	১ টুকরা	
ভিটামিন, খনিজ লবণ	রান্না করা বা কাঁচা সবজি	আধা কাপ	১০০ গ্রাম
	মৌসুমি ফল (আম, কলা, আপেল, কমলা ইত্যাদি)	১টি	১০০ গ্রাম
তেল ও চর্বি	ঘি/ মাখন/ ভোজ্যতেল	১ টেবিল চামচ	১৫-২০ গ্রাম

গর্ভবতী মায়েদের শরীরে আরেকটি শিশুর বৃদ্ধি হয়, তাই মায়েদের বাড়তি পুষ্টি প্রয়োজন। গর্ভবতী মায়েদের শরীর গঠনকারী, শক্তি প্রদানকারী, রোগ প্রতিরোধী খাদ্যের প্রয়োজন। অন্যদিকে বয়স বাড়লে শরীরে শক্তি কমে যায়, তাই বয়স্ক ব্যক্তিদের সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য দরকার। এদের সুস্থ থাকার জন্য সহজে হজম হয়, হাড় ও দাঁত মজবুত রাখে এবং রোগপ্রতিরোধী খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এসব কিছু বিবেচনা করেই সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করতে হয়।

২. সুষম খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখার জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ করা অপরিহার্য। সুষম খাদ্য বিশেষত শিশুদের সঠিকভাবে শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা করে, মস্তিষ্কের সুস্থতা বজায় রাখে। সুষম খাদ্য গ্রহণে শরীরে পুষ্টি চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ হয়।

? আমাদের সুষম খাদ্য গ্রহণ করা কেন প্রয়োজন?

কাজ: সুষম খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা শনাক্ত করা

যা করতে হবে:

পূর্বের পাঠসমূহের ধারণা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে সুষম খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজনীয়তা লেখো।

ক্রমিক	সুষম খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা
ক	
খ	
গ	

সারসংক্ষেপ

সুস্থ থাকার জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকার জন্য সঠিক পরিমাণ পুষ্টি উপাদান প্রয়োজন। সুষম খাদ্য গ্রহণ বয়স, লিঙ্গ এবং কাজের ধরনভেদে আলাদা হতে পারে।

সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরও কিছু জানি

আমরা আগে ছোটো ছিলাম। এখন ধীরে ধীরে বড়ো হচ্ছি। প্রতিদিন আমরা নানারকম কাজকর্ম, ছোটাছুটি, খেলাধুলা, লেখাপড়া করি। খেলতে গিয়ে সামান্য কেটে-ছিঁড়ে গেলে কোনো ওষুধ ছাড়াই কয়েক দিনের মধ্যে তা ভালো হয়ে যাচ্ছে। এর মূলে রয়েছে সুষম খাদ্য।

শিশুর বেড়ে ওঠা

খাদ্যের উপাদানগুলো আমাদের দেহে যে কাজ করে সেগুলো হলো–

- দেহের বৃদ্ধিসাধন ক্ষয়পূরণ ও সুরক্ষা প্রদান
- তাপ উৎপাদন ও কাজ করার শক্তি প্রদান
- শারীরবৃত্তীয় কর্মশক্তি প্রদান
- দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি ইত্যাদি।

প্রতিদিন প্রয়োজনীয় পরিমাণে সুষম খাদ্য গ্রহণ না করলে শরীরে পুষ্টির ভারসাম্য নষ্ট হয়। একটি খাদ্য উপাদানের অভাবে আরেকটি উপাদান শোষিত হয় না অথবা যথাযথ কাজ করে না। এর ফলে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খেলেও অনেকের পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। আবার কোনো উপাদান প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করলে স্থূলতাসহ নানারকম শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়। প্রতিদিনের খাবার সুষম না হলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে সহজে শরীরে রোগের আক্রমণ হতে পারে। প্রতিদিনের খাদ্য সুষম না হলে শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সঠিক অনুপাতে ও সময়মতো খাদ্য গ্রহণে ভালো ঘুম হয় এবং মানসিক চাপ কমে। খাদ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক পরিশ্রমের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে খাদ্য গ্রহণ করলে শরীর সুস্থ থাকে।

৩. সময়মতো খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব

সুস্থ থাকার জন্য শুধু সুষম এবং পুষ্টিকর খাবার খেলেই হবে না বরং সেগুলো আমরা কখন খাই, কতক্ষণ পরপর খাই, দিনে কতবার খাই সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অনেকেই খাবার গ্রহণের কোনো নিয়ম মেনে চলি না। যখন মনে হয় তখন অথবা একেক দিন একেক সময়ে খাই। আবার অনেকক্ষণ না খেয়েও থাকি।

? সময়মতো খাদ্য গ্রহণ করার উপকারিতা কী কী?

কাজ: সময়মতো খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব শনাক্তকরণ।

যা করতে হবে:

সময়মতো খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে নিচের ছকে লেখো।

ক্রমিক	সময়মতো খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব
ক	
খ	
গ	
ঘ	
ঙ	

সারসংক্ষেপ

সুস্থ থাকতে সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যের পাশাপাশি সঠিক সময়ে খাদ্য গ্রহণ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের যেমন নির্দিষ্ট সময়সূচি থাকে তেমনি খাদ্য গ্রহণেরও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে খাদ্য গ্রহণ করলে শরীর সুস্থ থাকে।

সময়মতো খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে আরও কিছু জানি

আমাদের শরীরে খাদ্য পরিপাকের জন্য নানা ধরনের উপাদান কাজ করে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, অপরিমিত এবং বিশৃঙ্খল খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায়। সময়মতো খাবার গ্রহণ না করলে পাকস্থলীতে আলসার বা ক্ষত, বদহজম, ওজন হ্রাস বা বৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, শরীর দুর্বল হয়ে পরে। সঠিক সময়ে খাবার খেলে–

- শরীর সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে
- মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
- শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সঠিকভাবে হয়।

প্রতিদিন সকাল ৮টার মধ্যে সকালের খাবার খেয়ে নেওয়া ভালো। দুপুরের খাবার গ্রহণের সঠিক সময় বেলা সাড়ে ১২টা থেকে ১টা। সকালের নাশতা মোটামুটি পেট ভরে খেলে দুপুরের খাবার মাঝারি পরিমাণের হওয়া উচিত।

রাতের খাবার সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে খেয়ে ফেলা ভালো। দেরিতে রাতের খাবার গ্রহণ করলে স্থূলতা বা মোটা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কোনো কারণে এই সময়ের মধ্যে খাওয়া সম্ভব না হলে অন্তত ঘুমানোর ঘণ্টা তিনেক আগে রাতের খাবার গ্রহন করা উচিত। রাতে সহজপাচ্য খাবার খাওয়া ভালো।

খাবার হজম হতে সাধারণত ৩-৪ ঘণ্টা সময় লাগে। এজন্য প্রতি বেলার খাদ্য গ্রহণের মাঝে কমপক্ষে ৪ ঘণ্টা বিরতি দেওয়া প্রয়োজন। এতে হজম ভালো হয়, পরিপাকতন্ত্র সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে এবং অতিরিক্ত মোটা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

নিয়মিত ও অনিয়মিত খাদ্যগ্রহণের প্রভাব

কাজ: নিয়মিত ও অনিয়মিত কাজের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

যা করতে হবে:

১. সহপাঠীর সাথে নিয়মিত ও অনিয়মিত খাদ্যগ্রহণের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করি।

২. আলোচনা শেষে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

নিয়মিত খাদ্যগ্রহণের প্রভাব	অনিয়মিত খাদ্যগ্রহণের প্রভাব
শরীর সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে	শরীরের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়

৪. খাদ্য সংরক্ষণ

সব ধরনের খাদ্যদ্রব্য আমরা সারাবছর বা সবসময় পাই না। কিছু খাদ্য শীতকালে, কিছু গ্রীষ্মকালে আবার কিছু বারো মাসই পাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য পচনশীল হওয়ায় সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। তাই সারাবছর খাদ্যদ্রব্য পেতে খাদ্য সংরক্ষণ প্রয়োজন হয়। জীবাণুর সংক্রমণ এবং পচন রোধ করে খাদ্যের স্বাদ ও গুণাগুণ অক্ষুণ্ন রাখার প্রক্রিয়াই হলো খাদ্য সংরক্ষণ।

? খাদ্য সংরক্ষণের উপায়সমূহ কী কী?

কাজ: বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের উপায় চিহ্নিতকরণ

যা করতে হবে:

১. আমাদের বাড়িতে কি কোনো ধরনের খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়? যদি করা হয় তাহলে কী উপায়ে সংরক্ষণ করা হয় তা নিচের ছকে লেখো।

খাদ্যের নাম	খাদ্য সংরক্ষণের উপায়
ধান, গম	শুকিয়ে সংরক্ষণ

সারসংক্ষেপ

খাদ্যের বৈশিষ্ট্য ও গুণগত মান ঠিক রেখে খাদ্যকে বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা যায়, যেমন–শুকিয়ে, ফ্রিজে রেখে, লবণ দিয়ে ইত্যাদি। এর ফলে খাদ্য বিষক্রিয়ামুক্ত ও নিরাপদ থাকে এবং দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়। আমরা ধান, সরিষা, গম, ভুট্টা, ডাল, আলু ইত্যাদি ফসল যেমন গুদাম বা হিমাগারে রেখে সংরক্ষণ করে থাকি তেমনি বাড়িতেও বিভিন্ন উপায়ে খাদ্য সংরক্ষণ করে থাকি।

খাদ্য সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে আরও কিছু জানি

শুকিয়ে সংরক্ষণ

বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্য সংরক্ষণ

রোদে অথবা ড্রায়ারে শুকিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ একটি প্রচলিত পদ্ধতি। খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার জন্য অনেক প্রকার খাদ্য আমরা শুকিয়ে সংরক্ষণ করি। যেমন– ধান, সরিষা, গম, ভুট্টা, ডাল, মাছ ইত্যাদি। এছাড়ও বিভিন্ন ধরনের মসলা, শিমের বিচি,

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

কাঁচা আম, বরই রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। এক্ষেত্রে বীজ শুকানোর পর সাধারণ তাপমাত্রায় ঠান্ডা করে সংরক্ষণ করা হয়। শুকনো ও বায়ুরোধী পাত্র ব্যবহার করা হয়। পাত্রের মুখ কাপড় বা মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ফ্রিজ বা হিমাগারে রেখে সংরক্ষণ

সাধারণ তাপমাত্রা ও পরিবেশে মাছ, মাংস, সবজি, ফল ইত্যাদি খুব দ্রুত পচে যায়। এসব খাদ্য ফ্রিজ বা হিমাগারে রেখে সহজেই সংরক্ষণ করা যায়। বাড়িতে সাধারণত ৪° সে. থেকে -১৮°সে. তাপমাত্রায় রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা হয়। এই তাপমাত্রায় খাদ্য পচনকারী অণুজীবগুলো নিষ্ক্রিয় থাকে। ফলে খাদ্যদ্রব্য সহজে পচে না এবং কয়েক মাস সংরক্ষণ করা যায়। বাণিজ্যিকভাবে হিমাগারে আলু, গাজর, মটরশুঁটি ও বিভিন্ন ধরনের মাছ বছরব্যাপী সংরক্ষণ করা হয়।

রেফ্রিজারেটর

লোনা ইলিশ

কিউরিং

কোনো খাদ্যকে খাবার লবণ বা এর দ্রবণ দ্বারা সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়াকে কিউরিং বলে। যখন ফ্রিজের প্রচলন ছিল না তখন কিউরিং খাদ্য সংরক্ষণের খুব জনপ্রিয় পদ্ধতি ছিল। এক সময় দেশে প্রচুর ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। তখন লবণ দিয়ে ইলিশ মাছ সংরক্ষণ করে সারা বছর খাওয়া হতো। এই পদ্ধতিতে মাংস, বিভিন্ন ফলমূল ও সবজি সংরক্ষণ করা যায়।

জেলি আচার

আচার ও জ্যাম-জেলি

যখন কোনো খাদ্যকে (ফল ও সবজি) সাধারণত লবণ বা চিনি, সরিষার তেল, ভিনেগার এবং মসলা ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা হয় তখন প্রস্তুতকৃত খাদ্যকে আচার বলে। যেমন–আম, জলপাই, আমড়া, রসুন, চালতা, তেঁতুল, লেবু ইত্যাদির আচার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আচার তৈরিতে লবণ, চিনি, ভিনেগার, তেল খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ফল বা ফলের রস চিনির সাথে মিশিয়ে জ্যাম-জেলি হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।

৫. খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে প্রথম চাহিদা হলো খাদ্য। পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়ার জন্য খাদ্য সংরক্ষণ জরুরি। আবার সুস্থ থাকতে প্রতিটি মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপদ হওয়া প্রয়োজন। পর্যাপ্ত এবং নিরাপদ খাদ্য পাওয়ার জন্য খাদ্য সংরক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্য সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

কাজ: খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব শনাক্তকরণ

যা করতে হবে:

১. পাশের সহপাঠীর সাথে খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করে তা ধারণাচিত্রে লেখো।

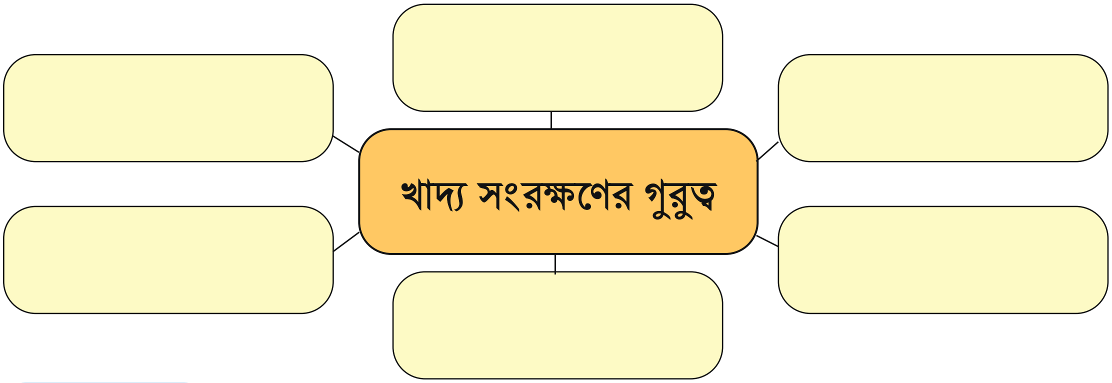

সারসংক্ষেপ

খাদ্য রান্না করা বা কাঁচা যা-ই হোক প্রাকৃতিক কারণে অল্প সময়ের ব্যবধানে তা নষ্ট বা খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। খাদ্য সংরক্ষণের ফলে খাদ্য সতেজ ও এর গুণগত মান অক্ষুণ্ণ থাকে। ফলে দ্রুত পচন থেকে খাদ্যকে রক্ষা করে অপচয় রোধ করা যায়।

খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে আরও কিছু জানি

মাছ, মাংস, ফল , শাকসবজি, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য সহজেই অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হয়। এর ফলে খাদ্য নষ্ট বা খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। খাদ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার ফলে খাবারে পচন সৃষ্টিকারী অণুজীব জন্মাতে দেয় না। আমাদের দেশে ধান, গম, ভুট্টা, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয়। খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে এইসব খাদ্য সারা দেশে সরবরাহ করা হয় এমনকি বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হয়। খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে যেকোনো মৌসুমে উৎপাদিত খাদ্য সারাবছর ধরে পাওয়া যায়। যেমন– শীতকালে উৎপাদিত আলু হিমাগারে রেখে সারা বছরের চাহিদা মেটানো হয়। খাদ্যের অপচয় রোধ, গুণাগুণ বজায় রাখা এবং সরবরাহ নিশ্চিত করতে খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দিই

ক) নিচের কোনটি শর্করা জাতীয় খাদ্য?

☐ ডিম ☐ আলু ☐ মাখন ☐ মৌসুমি ফল

খ) পাশের চিত্রের ফলমূলে নিচের কোনটি অধিক পরিমাণে থাকে?

☐ ভিটামিন-বি ☐ ভিটামিন-সি
☐ ভিটামিন-ডি ☐ ভিটামিন-কে

গ) কিউরিং পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য–

☐ রোদে রেখে শুকিয়ে নেওয়া হয় ☐ কম তাপমাত্রায় অধিক ঠান্ডা স্থানে রাখা হয়
☐ লবণ মিশিয়ে সংরক্ষণ করা হয় ☐ চিনি, তেল, ভিনেগার মিশিয়ে রাখা হয়

ঘ) অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের ফলে–

☐ রোগের সংক্রমণ হলেও দ্রুত সুস্থ হওয়া যায় ☐ পাকস্থলীতে ক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা কমে
☐ মন সবসময় ভালো ও উৎফুল্ল থাকে ☐ স্থূলতা ও বিষণ্নতা দেখা দিতে পারে

২. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক) আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ কেন প্রয়োজন?

খ) সুষম খাদ্য গ্রহণের উপকারিতা লেখ।

গ) যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ ও তেল সমৃদ্ধ খাবার খেলেও পুষ্টিহীনতা থাকতে পারে– কেন?

৩. বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক) খাদ্য সংরক্ষণ কাকে বলে? খাদ্য সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ কেন তা লেখ।

খ) নিয়মিত খাদ্যগ্রহণ কীভাবে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে?

গ) কম খরচে সুষম খাদ্যতালিকা কীভাবে করা যায়?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

অধ্যায় ৪

বয়ঃসন্ধিকাল

জন্মের পর আমরা কতই-না অসহায় ছিলাম! আমরা চলাফেরা করতে পারতাম না, কথা বলতে পারতাম না, ক্ষুধা লাগলে খাবার চাইতে পারতাম না। সব কিছুর জন্য মা-বাবার ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। এরপর আমাদের শরীর এবং মনে ধীরে ধীরে নানা ধরনের পরিবর্তন এসেছে। আমরা শারীরিকভাবে যেমন বড়ো হচ্ছি তেমনি মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছি, নিজেদের প্রয়োজনের কথাও নিজেরা বলতে পারছি। আমাদের আচরণেও পরিবর্তন এসেছে। এটিই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আমাদের মা-বাবা, বড়ো ভাই-বোন, অথবা আমাদের থেকে বয়সে যারা বড়ো তারাও ঠিক একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। এভাবে জীবনের যে পর্যায়ে একজন মানুষ নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে অর্থাৎ বাল্যকাল থেকে কৈশোরে পা রাখে, মানবজীবনের সেই পর্যায়কে বয়ঃসন্ধিকাল বলে।

১. বয়ঃসন্ধিকাল

? মানব জীবনে শারীরিক পরিবর্তনের ধারাবাহিক ধাপসমূহ এবং বিভিন্ন ধাপে শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

চিত্র: মানুষের জীবনে শারীরিক পরিবর্তনের ধারাবাহিক ধাপসমূহ

কাজ: মানুষের জীবনে শারীরিক পরিবর্তনের ধারাবাহিক ধাপসমূহ এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ

যা করতে হবে:

১. উপরের চিত্রগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

২. মানুষের শারীরিক পরিবর্তনের ধাপসমূহ এবং প্রতি ধাপের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ছকে লেখো।

পরিবর্তনের ধাপ	শারীরিক বৈশিষ্ট্য

সারসংক্ষেপ

জন্মের পর থেকে শুরু করে বার্ধক্য পর্যন্ত আমাদের সকলকে শারীরিক পরিবর্তনের কতগুলো ধারাবাহিক ধাপ অতিক্রম করতে হয়। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো বয়ঃসন্ধিকাল। এটি জীবনের এমন এক পর্যায় যখন আমাদের শরীর শিশু অবস্থা বা শৈশবকাল থেকে কিশোর অবস্থা বা কৈশোরকালে পৌঁছে। আমরা শারীরিক পরিবর্তনের কোন ধাপে আছি এবং নিজেদের মধ্যে কী কী শারীরিক পরিবর্তন অনুভব করেছি এ সম্পর্কে নিচের খালি জায়গায় লেখো।

বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে আরও কিছু জানি

সাধারণত মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল হলো ৮ থেকে ১৩ বছর এবং ছেলেদের ৯ থেকে ১৫ বছর। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের শরীর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে ওজন বাড়ে, উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। এ সময় তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি, কৌতূহল, লজ্জা, আবেগ প্রবণতা, বিষণ্ণতা ও অস্থিরতা দেখা দেয়; তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে চায়। ছেলেদের ক্ষেত্রে পুরুষালি বৈশিষ্ট্য যেমন– দাড়ি, গোঁফ গজাতে থাকে, গলার স্বরও মোটা এবং ভারী হতে থাকে। তাছাড়াও

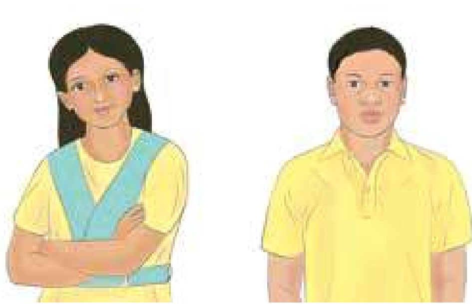

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরী

ছেলেদের পেশি সুগঠিত কাঁধ চওড়া হতে থাকে। একইভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। তাদের শরীর কিছুটা ভারী হতে থাকে এবং মেয়েলি বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। এ সময় ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের মুখে ব্রণ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া শরীর অনেক বেশি ঘামতে পারে এবং

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

ঘামে গন্ধ থাকতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকাল হলো আমাদের বড়ো এবং পরিণত হয়ে ওঠার অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। মেয়েদের শরীর থেকে বয়ঃসন্ধিকালে প্রতি মাসে অল্প কিছু দিনের জন্য রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে, এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এতে ভয় বা লজ্জা পাওয়া কিংবা বিব্রত হওয়ার কিছু নাই। মা-বাবা, বড়ো বোন বা পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক ও বিশ্বস্ত কোনো সদস্যের সাথে এসব ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনা করলে যেকোনো সমস্যার সহজে সমাধান সম্ভব হয়। মনে রাখতে হবে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলো সকলের একই সময়ে বা একইভাবে হয় না। পরিবর্তনগুলো কারো ক্ষেত্রে আগে কারো ক্ষেত্রে দেরিতে হতে পারে।

২. বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন

মানব জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল পর্যায় হলো বয়ঃসন্ধিকাল। এ সময় শরীরে যেমন নতুন নতুন বেশ কিছু পরিবর্তন আসে তেমনি কিশোর-কিশোরীদের চিন্তা, অনুভূতি এবং আচরণেও পরিবর্তন আসে। বয়ঃসন্ধিকালে সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের যত্ন অপরিহার্য। এ সময় কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আবেগপ্রবণতা, ভয়, ভীতি এবং লজ্জা কাজ করে এবং ঘন ঘন মেজাজের পরিবর্তন হয়। এজন্য বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

? বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার উপায়গুলো কী কী?

কাজ: বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার উপায়গুলো শনাক্তকরণ

যা করতে হবে:

১. নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার ৫টি উপায় লেখো।
২. নিজের পর্যবেক্ষণ নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

ক্রমিক	শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার উপায়সমূহ
১	
২	
৩	
৪	

সারসংক্ষেপ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, নিরাপদ পানি পান, সুষম ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের প্রধান শর্ত। বাইরের তৈরি খাবার বর্জন করলে অনেক শারীরিক সমস্যা ও রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়,

শরীর সুস্থ থাকে। তাছাড়াও নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলা করলে এবং নিজের কাজগুলো নিজে করলে শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মনও ভালো থাকে।

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার উপায় সম্পর্কে আরও কিছু জানি

বয়ঃসন্ধিকাল আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারণ এটি আমাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের সময়। এ সময় সুষম এবং পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ খুবই প্রয়োজন। বয়ঃসন্ধিকালে যেহেতু শারীরিক বৃদ্ধি দ্রুত হয়, এজন্য মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল ইত্যাদি প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খেতে হয়। ভাত, রুটি ইত্যাদি শর্করা ও চর্বি যেমন– তেল, ঘি দিয়ে তৈরি খাবারও খাওয়া প্রয়োজন। তাছাড়াও বিভিন্ন প্রকার ছোটো মাছ (যেমন– মলা, ঢেলা ইত্যাদি), রঙিন শাকসবজি এবং বিভিন্ন রকমের ফল খেতে হয়।

অতিরিক্ত ভাজাপোড়া খাবার, কোমল পানীয়, বাইরের তৈরি খাবার, জাঙ্ক ফুড (যেমন– চিপস্, বার্গার, পিৎজা, চকোলেট, মিষ্টিজাতীয় খাবার ইত্যাদি) অবশ্যই বর্জন করতে হবে। এসব খাবারে প্রচুর আস্বাস্থ্যকর চর্বি ও চিনি থাকে। এসব খাদ্যগ্রহণে স্থূলতা, হৃদপিণ্ডের রোগ, অল্প বয়সে ডায়াবেটিস আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

বর্জনীয় খাবার

পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান

নিয়মিত পর্যাপ্ত ঘুম

নিরাপদ পানির অপর নাম জীবন। তাই স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ পানি পান করা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রতিদিন নিয়মিত কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা ঘুমাতে হবে। বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত ঘুম খুবই প্রয়োজন।

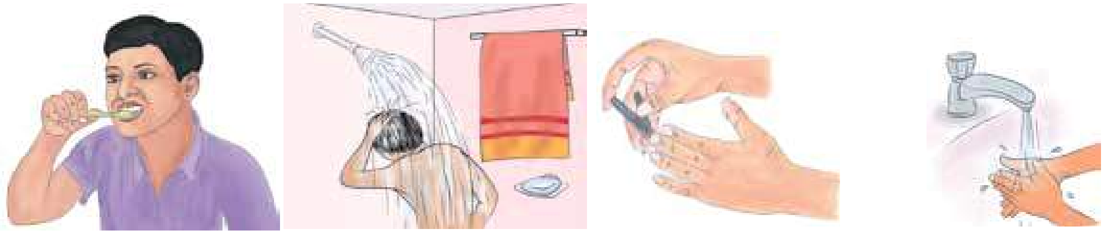

দৈনন্দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

ঘুম থেকে উঠে এবং রাতে ঘুমানোর পূর্বে দাঁত ব্রাশ করা, প্রতিদিন গোসল করা, হাতের নখ, চুল ছোটো রাখা প্রয়োজন। বাথরুম ব্যবহারের পর এবং খাওয়ার পূর্বে নিয়মিত সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধোয়া পেটের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর পেট ভালো থাকলে অনেক রকম জটিল রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলা

বয়ঃসন্ধিকালে মন বা মানসিক স্বাস্থ্যেরও যত্ন প্রয়োজন হয়। নিয়মিত শরীরচর্চা, খেলাধুলা করা, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানো, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠা এবং প্রতিদিন সূর্যের আলোতে যাওয়া দরকার। এতে রোগবালাই কম হয়।

ঘর মোছা

মায়ের কাজে সহযোগিতা

বই পড়া

ছবি আঁকা

নিজের বিছানা গোছানো

নিজের পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখা

বাবার কাজে সহযোগিতা করা

বিদ্যালয়ের আঙিনা পরিষ্কার করা

নিজের বিছানা ও পড়ার টেবিল পরিষ্কার করলে, নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে এবং পরিষ্কার পোশাক পরলে শরীর ও মন উভয়ই ভালো থাকে। বিদ্যালয় এবং বাড়ির আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে, মা-বাবাকে তাদের কাজে সহযোগিতা করলেও শরীর ও মন ভালো থাকে। আর শরীর ও মন ভালো থাকলে আনন্দের সাথে সকল কাজ সম্পন্ন করা যায়। এছাড়াও নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস, ছবি আঁকা, ধর্মচর্চা মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে।

৩. বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলোকে স্বাভাবিক হিসেবে উপলব্ধিকরণ

? বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলোকে স্বাভাবিক পরিবর্তন হিসেবে গ্রহণ করতে আমরা কী করতে পারি?

কাজ: বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলোকে স্বাভাবিকভাবে উপলব্ধি করে সুন্দর জীবন গঠনে করণীয় চিহ্নিতকরণ

যা করতে হবে:

১. নিচে আলাদা দুটো ঘটনা দেওয়া আছে। মনোযোগসহকারে পড়ি।

২. ছবি দেখা ও ঘটনা পড়া শেষ হলে প্রত্যেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর ছকে লেখো।

ঘটনা-১	
পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী নাবিলা খুবই নম্র, ভদ্র এবং হাসিখুশি মেয়ে। সে পড়াশোনাতেও ভালো। কিছুদিন ধরে নাবিলা লক্ষ করছে, সে বেশ লম্বা হয়েছে, পুরোনো জামাগুলো এখন আর গায়ে লাগছে না। সে কিছুটা ভীত, বিব্রত এবং চিন্তিত হয়ে পড়েছে। খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলা বা সহপাঠীদের সাথে গল্প করতে এখন আর ভালো লাগে না। শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনায়ও মনোযোগ দিতে পারছে না।	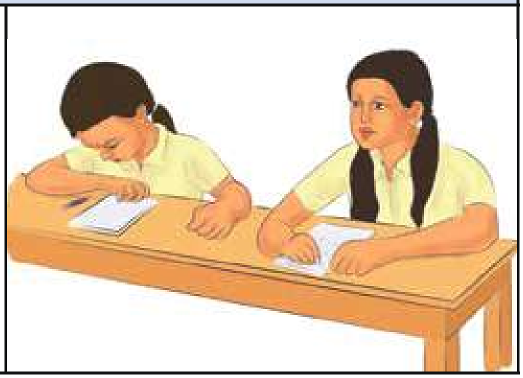

ঘটনা-২	
নাবিলার সহপাঠী সুমন আজকাল প্রায়ই স্কুলে আসছে না। শিক্ষক তার বাড়িতে খোঁজ নিলে মা বললেন, সে প্রতিদিন স্কুল ড্রেস পরেই বাড়ি থেকে বের হয় কিন্তু সময়মতো বাড়ি ফিরে না। কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বিরক্তি প্রকাশ করে। বন্ধুরা বলল, সে ক্লাসে না এলেও ক্লাসের সময়ে স্কুলের বাইরে তার চেয়ে বড়ো কয়েকজন ছেলের সাথে সময় কাটায়।	

ক. নাবিলা ও সুমনের বয়স কত হতে পারে?	
খ. নাবিলা ও সুমন তাদের জীবনের কোন সময় অতিক্রম করছে?	
গ. সুন্দর জীবন গঠনের জন্য নাবিলা ও সুমন কী কী করতে পারে?	
ঘ. সহপাঠী হিসেবে নাবিলা ও সুমনকে কীভাবে সহযোগিতা করতে পারো?	

সারসংক্ষেপ

ভয় বা লজ্জা নয়, বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলোকে স্বাভাবিকভাবে নিতে হবে। বই পড়া, নিয়মিত শরীরচর্চা, ব্যায়াম, খেলাধুলা করলে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে। তাছাড়াও ছবি আঁকা, নাচ-গান করা, কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক, কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি সৃজনশীল কাজেও অংশগ্রহণ করা যায়।

বয়ঃসন্ধিকালে সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন গঠন সম্পর্কে আরও কিছু জানি

বয়ঃসন্ধিকালে আমরা যে শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তনগুলো অনুভব করি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলে অনেক সমস্যা সহজে সমাধান করা সম্ভব হয়, সুস্থ থাকা যায়। এজন্য পরিবারে দাদা-দাদি, নানা-নানি, মা-বাবা, বড়ো ভাই-বোনের সাথে পরিবর্তনগুলো নিয়ে খোলা মনে আলোচনা করলে তারা আমাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারেন। অনেক সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য নির্ভরযোগ্য হয় না বা সেগুলোতে ভুল থাকতে পারে। এজন্য প্রয়োজনে মা-বাবা, বড়ো ভাই-বোন বা পরিবারের বিশ্বস্ত কোনো সদস্যের সহায়তায় নিকটস্থ কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে বা স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে কথা বলে পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষকের সঙ্গেও আলোচনা করা যায়।

কাজ: শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার চেকলিস্ট পূরণ।

১। সপ্তাহের ৭ দিন স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন এবং শরীরের যত্নে আমি কী কী করেছি, তার ওপর একটি তালিকা পূরণ করি। ‘আমি যে কাজগুলো প্রতিদিন করেছি’ সেই ঘরে টিক (√) চিহ্ন দিই। (উদাহরণ হিসেবে ১টি করে দেখানো হয়েছে)।

২। ৭ দিন পর চেকলিস্ট পর্যবেক্ষণ করে আমি স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন করেছি কি না তা বিশ্লেষণ করি।

চেকলিস্ট

তারিখ	সকালে ও রাতে দাঁত ব্রাশ করেছি	সকালে সূর্যের আলোতে গিয়েছি	শরীরচর্চা/ ব্যায়াম/ খেলাধুলা করেছি	বাথরুম ব্যবহারের পর সাবান/ ছাই দিয়ে হাত ধুয়েছি	নিজের বিছানা ও পড়ার টেবিল গুছিয়েছি	চুল, নখ পরিষ্কার করেছি	মা-বাবাকে বাড়ির কাজে সাহায্য করেছি	বাইরের তৈরি খাবার/ জাঙ্ক ফুড খেয়েছি	গোসল করেছি	মাছ/ মাংস/ ডিম এবং শাকসবজি খেয়েছি
৫/৫/২৬	√			√			√	√		

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দিই

ক) বয়ঃসন্ধিকাল সাধারণত কোন সময় হতে শুরু হয়?

☐ বাল্যকাল ☐ শৈশবকাল ☐ কৈশোর ☐ যৌবনকাল

খ) বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের মধ্যে নিচের কোন পরিবর্তনটি লক্ষ করা যায়?

☐ পেশি সুগঠিত হয় ☐ শরীর কিছুটা ভারী হয়
☐ গলার স্বর মোটা হয় ☐ কাঁধ চওড়া হয়

গ) বয়ঃসন্ধিকালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা জরুরি, কারণ এতে–

☐ শরীর রোগমুক্ত থাকে ☐ শারীরিক সৌন্দর্য বজায় থাকে
☐ রাতে ভালো ঘুম হয় ☐ মন ভালো থাকে

২. শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্বাচন করি

ক্রমিক	বিবৃতি	শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ
১	বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক পরিবর্তন কোনো স্বাভাবিক পরিবর্তন নয়	
২	সাধারণত ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকাল ৯ থেকে ১৫ বছর	
৩	বাবা-মা অথবা বাসার বড়োদের সাথে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নাই	
৪	বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলো সকলের একই সময়ে বা একইভাবে হয় না	

৩. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বয়ঃসন্ধিকালে শরীর ও মন সুস্থ রাখার উপায়গুলো কী কী?

২. ছেলেদের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালে যেসব পরিবর্তন দেখা দেয়, সেগুলো লেখ?

৪. বর্ণনামূলক -উত্তর প্রশ্ন

১. ‘বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন একজন শিশুর বড়ো হয়ে উঠার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া’– ব্যাখ্যা করো।

২. বয়ঃসন্ধিকালে সুষম ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

অধ্যায় ৫

পদার্থের গঠন

আমাদের চারপাশে অনেক বস্তু দেখছি। সকল বস্তুই খুব ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি, যাকে আমরা অণু বলি। অর্থাৎ পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাই অণু। এই অণুকে ভাংলে পাওয়া যায় পরমাণু। এই অধ্যায়টিতে আমরা অণু-পরমাণু সম্পর্কে জানব। আমরা বিভিন্ন রকম পদার্থের সংরক্ষণ ও পুনর্ব্যাবহার করে পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে কী ভূমিকা রাখতে পারি সে সম্পর্কে জানব।

১. পরমাণু ও অণুর ধারণা

? পদার্থকে বিভাজন করলে কী পাওয়া যায়?

কাজ: এক খন্ড চক গুঁড়া করে অণু সম্পর্কে ধারণা গঠন।

যা করতে হবে:

১। একটি চক নিই। সেটিকে দুই ভাগ করি।

২। সেই ভগ্নাংশটি পাশের সহপাঠীর হাতে দিই। আবার সেটিকে দুই ভাগ করি।

৩। এভাবে যতবার সম্ভব ভাগ করি।

৪। এবার ক্ষুদ্র অংশটিকে হাতুড়ি দিয়ে গুঁড়ো করি। মিহি গুঁড়ো হাতে নিয়ে এর আকার অনুভব করার চেষ্টা করি।

৫। নিচের প্রশ্নটি নিয়ে ভাবি।

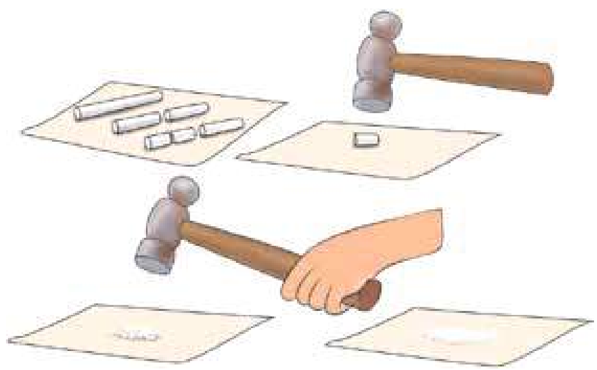

চকের মিহি গুঁড়াকে আরও ছোটো করা সম্ভব? – মতামত ছকে লেখো।

সারসংক্ষেপ

আমরা চকের মিহি গুঁড়াকে ভেঙে আরো ছোটো করতে পারি। ছোটো করতে করতে ক্ষুদ্রতম একটি অংশ পাবো যা খালি চোখে দেখা যায় না। এটিকে ভাংলে আর পদার্থের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। [পদার্থের এর চেয়েও ছোট অংশ হল অণু।]

পরমাণু ও অণু সম্পর্কে আরও কিছু জানি

যেকোনো পদার্থের গাঠনিক একক হলো পরমাণু। মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যাকে আর ভাঙা যায় না এবং পদার্থের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তা হলো অ্যাটম বা পরমাণু। অ্যাটম (atom) শব্দটি গ্রিক 'atomos' শব্দ থেকে এসেছে, এর অর্থ অবিভাজ্য। এই অ্যাটম বা পরমাণু এতই ছোটো যে, এদের খালি চোখে দেখা যায় না, এমনকি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না। এক বা একাধিক পরমাণু মিলে তৈরি করে অণু। আবার অণুকে ভাংলে পাওয়া যায় পরমাণু।

যে পদার্থের অণুতে একই ধরনের পরমাণু পাওয়া যায় তাকে বলে মৌলিক পদার্থ বা মৌল। কোনো কোনো মৌলের অণুতে একটি পরমাণু থাকে। যেমন– সোডিয়াম। আবার কোনো কোনো মৌলের অণুতে একাধিক পরমাণু পাওয়া যায়। যেমন– অক্সিজেনের অণুতে দুটি পরমাণু থাকে। কোনো কোনো পদার্থের অণু একাধিক রকমের পরমাণু দিয়ে গঠিত। এদেরকে বলে যৌগিক পদার্থ বা যৌগ। যেমন– পানি একটি যৌগ, পানির অণুতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন এই দুই রকমের পরমাণু পাওয়া যায়। অণু হলো পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ যা সেই পদার্থের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

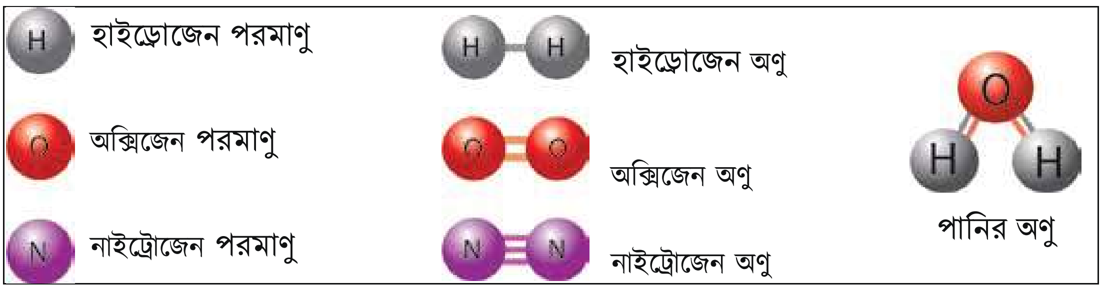

কাজ: পানির অণুর চিত্র অঙ্কন

যা করতে হবে:

অক্সিজেন পরমাণুর দুটি হাত এবং হাইড্রোজেন পরমাণুর একটি হাত আছে। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মৌলের পরমাণু কীভাবে একে অপরের হাত ধরে থাকবে তা চিত্রের মাধ্যমে দেখাই।

		পানির অণুর চিত্র অঙ্কন করি।
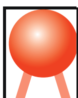	এটিকে আমরা যদি একটি অক্সিজেনের পরমাণু ভাবি	
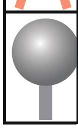	এটিকে আমরা যদি একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু ভাবি	

২. পদার্থের গঠন

আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখতে পাই তার সবকিছুই পরমাণু দিয়ে গঠিত। যে পদার্থে একই ধরনের পরমাণু পাওয়া যায় তাকে বলে মৌলিক পদার্থ। লোহা (আয়রন), সোডিয়াম এরা মৌলিক পদার্থ। লোহা বা আয়রনের ক্ষুদ্রতম কণা হলো আয়রন পরমাণু।

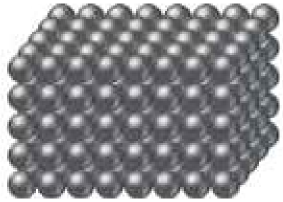
আয়রন পরমাণুসমূহ

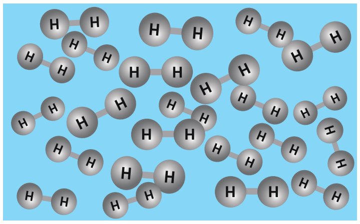
হাইড্রোজেন গ্যাসে হাইড্রোজেন অণুসমূহ

কোনো কোনো মৌলিক পদার্থে একই মৌলের একাধিক পরমাণু একত্রিত হয়ে অণু হিসেবে থাকে। যেমন–হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে একটি হাইড্রোজেন অণু গঠন করে থাকে। হাইড্রোজেন গ্যাসে অসংখ্য হাইড্রোজেন অণু থাকে।

কোনো কোনো পদার্থের অণু একাধিক রকমের পরমাণু দিয়ে গঠিত। এদের বলে যৌগিক পদার্থ বা যৌগ। যেমন-পানি একটি যৌগ। পানির অণুতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন দুই রকমের পরমাণু পাওয়া যায়। বিভিন্ন মৌলের দুই বা ততোধিক পরমাণু একত্রিত হয়ে যে যৌগিক অণু গঠন করে তার গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য পরমাণুগুলো থেকে আলাদা। যেমন–পানির বৈশিষ্ট্য অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

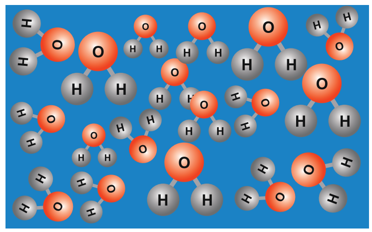
পানির অণুসমূহ

৩. অণুর ধারণায় পদার্থের তিন অবস্থা

আমরা ইতোমধ্যে পদার্থের তিন ধরনের ভৌত অবস্থা সম্পর্কে জেনেছি। এখানে অণুর ধারণায় পদার্থের তিন ধরনের ভৌত অবস্থা সম্পর্কে জানব।

কঠিন পদার্থের অণুগুলো একে অপরের সাথে শক্তভাবে এবং সুনির্দিষ্ট বিন্যাসে যুক্ত থাকে। এদের মধ্যে পারস্পরিক বল (আন্তঃআণবিক বল) খুব শক্তিশালী এবং নড়াচড়া করে না। এজন্য কঠিন পদার্থের আকার, আকৃতি ও আয়তন নির্দিষ্ট থাকে। যেমন– বরফ অবস্থায় পানির অণু একে অপরের সাথে শক্ত করে লেগে থাকে। অণুগুলোর মাঝখানে কোনো ফাঁক থাকে না এবং নড়াচড়াও করে না। ফলে বরফের আকার-আকৃতি ঠিক থাকে।

তরল পদার্থের অণুগুলো একে অপরের কাছাকাছি থাকে এবং তাদের মধ্যে আন্তঃআণবিক বল কম থাকে। তরল পদার্থের অণুগুলো কোনো নির্দিষ্ট বিন্যাসে যুক্ত থাকে না। পানির অণুগুলো এখানে একে অপরের থেকে আলাদা কিন্তু কাছাকাছি থাকে। তারা একটু বেশি নড়াচড়া করতে পারে এবং স্বাধীনভাবে প্রবাহিত হতে বা গড়িয়ে যেতে পারে। ফলে তরল পদার্থকে এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে ঢালা যায়।

বায়বীয় পদার্থের অণুগুলো একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে না বরং এরা মুক্ত ও স্বাধীন। অণুগুলোর মাঝে আন্তঃআণবিক বল খুব দুর্বল এবং এরা দ্রুতগতিতে চারিদিকে চলাচল করে। ফলে বাষ্পীয় অবস্থায় পানির নির্দিষ্ট কোনো আকার বা আয়তন নেই। এরা আবদ্ধ পাত্রের সবটুকু আয়তন জুড়ে থাকে, পাত্র খোলা রাখলে তা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

৪. মিশ্রণের উপাদান পৃথকীকরণ

আমরা নিশ্চয়ই চানাচুর খেয়েছি। অনেকগুলি জিনিস, যেমন-বাদাম, ডাল, চিড়া, বিভিন্ন রকম মসলাসহ আরও কিছু উপাদান একত্রে মিশিয়ে তৈরি করা হয় চানাচুর। মিশ্রণের মধ্যে তার উপাদানগুলো মিলেমিশে পাশাপাশি অবস্থান করে, কিন্তু নতুন কোনো পদার্থ তৈরি করে না। মিশ্রণের মধ্যে উপাদানগুলো তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ বজায় রাখতে পারে। আমরা ইতোমধ্যে মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ সম্পর্কে জেনেছি। মিশ্রণও এক ধরনের পদার্থ যেখানে একাধিক মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ পাশাপাশি থাকে।

কাজ: মিশ্রণ ও মিশ্রণের উপাদান চিহ্নিতকরণ।

যা করতে হবে:

আমাদের চারপাশে যেসব মিশ্রণ দেখি তাদের নাম ও উপাদানসমূহ নিচের ছকে লিখে রাখি। নমুনা হিসেবে একটি পূরণ করে দেওয়া আছে।

মিশ্রণের নাম	মিশ্রণে যে উপাদানগুলো রয়েছে তাদের নাম
খাবার স্যালাইন	লবণ, পানি, চিনি অথবা গুড়

মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলোকে কীভাবে পৃথক করতে পারি?

কাজ: মিশ্রণের উপাদান পৃথক করা

যা করতে হবে:

১. বালু ও লোহার গুঁড়ার মিশ্রণ সংগ্রহ করে সাদা কাগজের উপর নিই।

২. একটি চুম্বক নিয়ে মিশ্রণের ভিতরে নাড়াচাড়া করি। দেখা যাবে চুম্বকের গায়ে কালো রঙের গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ লেগে আছে। এগুলোই লোহার গুঁড়া। অন্য একটি কাগজে লোহার গুঁড়াগুলো সংগ্রহ করি।

৩. কয়েকবারের চেষ্টায় লোহার গুঁড়াগুলো আলাদা করি।

চুম্বকের মাধ্যমে পৃথক করা

সারসংক্ষেপ

এখানে লোহার চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে অচৌম্বকীয় পদার্থ আলাদা করা হয়েছে। এভাবে চুম্বক ব্যবহার করে আমরা পানি বা অন্য কোনো জায়গা থেকে লোহা বা লোহা জাতীয় জিনিস খুঁজে বের করতে পারি। আমরা এখন পর্যন্ত যে কাজগুলো করেছি তা থেকে নিশ্চয়ই বুঝেছি যে, সব মিশ্রণ থেকে তার উপাদানগুলোকে পৃথক করার পদ্ধতি একই রকম না। মিশ্রণ থেকে তার উপাদানসমূহে পৃথক করার জন্য বিভিন্ন রকম পদ্ধতি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়।

মিশ্রণের উপাদান পৃথকীকরণ সম্পর্কে আরও কিছু জানি

মিশ্রণে দুই বা ততোধিক পদার্থ নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে পাশপাশি অবস্থান করে। কোনো কোনো মিশ্রণে উপাদানগুলো সর্বত্র সমানভাবে বিস্তৃত থাকে। এটাকে বলে সমসত্ব মিশ্রণ। যেমন– চিনির শরবত। এই মিশ্রণের উপাদান হলো পানি ও চিনি। শরবতের মধ্যে পানি ও চিনির অবস্থান সর্বত্র একই থাকে। যদিও শরবতে চিনির উপস্থিতি বোঝা যায় না। আবার কোনো কোনো মিশ্রণে প্রতিটি উপাদানের উপস্থিতি বোঝা যায়। মিশ্রণের মধ্যে উপাদানগুলো সাধারণভাবে মিশ্রিত থাকে, কোথাও বেশি বা কোথাও কম। এটাকে বলে অসমসত্ব মিশ্রণ। যেমন– বালু ও লোহার গুঁড়ার মিশ্রণ।

আমাদের প্রয়োজনে আমরা মিশ্রণের উপাদান পৃথক করি। বিভিন্নভাবে আমরা মিশ্রণের উপাদান পৃথক করতে পারি। যেমন– ধান ও ধানের চিটার মিশ্রণ থেকে ধানের চিটা পৃথক করতে বাতাস ব্যবহার করি। চায়ের লিকার থেকে চা পাতা পৃথক করার জন্য ছাঁকনি ব্যবহার করি।

তাপ দিয়ে বাষ্পীকরণ প্রক্রিয়ায় চিনির শরবত থেকে চিনি আলাদা করা যায়। শরবতে তাপ প্রয়োগ করলে পানি বাষ্প হয়ে যায়। চিনি পাত্রের তলায় থেকে যায়। কোন উপায়ে উপাদান পৃথক করব তা উপাদানের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে। বাতাস, তাপ, ছাঁকনি, চুম্বক ব্যবহার করে মিশ্রণের উপাদান পৃথক করতে পারি।

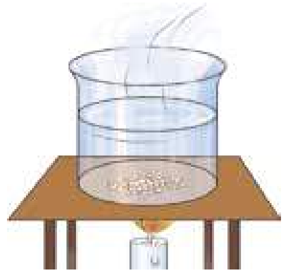

৫. বস্তুর (পদার্থের) সংরক্ষণ ও পুনর্ব্যবহার

কোনো অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বা আবর্জনা যখন বায়ু, মাটি ও পানিতে চলে আসে তখন পরিবেশ দূষিত হয়। বায়ু দূষণের কারণে আমাদের ফুসফুসের রোগ হয়। পানি দূষিত হলে আমরা নানাভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি, সাথে সাথে অন্যান্য প্রাণীও অসুস্থ হয়ে পড়ে। মাটি দূষণের কারণে মাটি তার উর্বরতাশক্তি হারায়; ফলে ফসলের উৎপাদন কম হয়। গাছ সঠিকভাবে প্রকৃতিতে বেড়ে উঠতে পারে না। আবর্জনা কমানো এবং বিভিন্ন দ্রব্য সঠিকভাবে পুনঃব্যবহার করার মাধ্যমে পরিবেশকে পরিষ্কার রাখার মাধ্যমে আমরা সুস্থ থাকতে পারি।

? বস্তুর (পদার্থের) সংরক্ষণ ও পুনর্ব্যবহারে আমরা কী করতে পারি?

কাজ: ফেলে দেওয়ার জিনিসপত্রের তালিকা তৈরি

যা করতে হবে:

১. বাসায় ও বিদ্যালয়ে ব্যবহারের পর অনেক জিনিস ফেলে দিই। সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করি।
২. তালিকার জিনিসগুলো কী দিয়ে তৈরি এবং এগুলো দিয়ে পুনরায় কী করা যায় তা ছকে লেখো।

জিনিসপত্রের নাম	কী দিয়ে তৈরি	কী করতে পারি
পানির বোতল	প্লাস্টিক	রান্নাঘরে পুনর্ব্যবহার, ফুলের টব, কলমদান তৈরি

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

বস্তুর (পদার্থের) সংরক্ষণ ও পুনর্ব্যবহার সম্পর্কে আরও কিছু জানি

আমরা প্রতিনিয়ত অনেক জিনিস ব্যবহার করে অথবা না করে ফেলে দিই, যা পরিবেশ নষ্ট করে। এই বস্তুগুলোর পুনর্ব্যবহার করে, কম ব্যবহার করে এবং পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে পারি।

ব্যবহার কমানো (Reduce)

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য এটি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা যখন কোনো জিনিস ব্যবহার করব তখন মিতব্যয়ী হব। গোসল করা, দাঁত ব্রাশ এবং অন্যান্য কাজে পানি ব্যবহারের সময় অযথা পানির কল খুলে রেখে পানির অপচয় করব না। যে রুম থেকে বের হবার সময় রুমের লাইট ফ্যান ইত্যাদি বন্ধ করে যাব। এমনিভাবে প্রতিক্ষেত্রেই আমরা মিতব্যয়ী আচরণ করব।

পুনরায় ব্যবহার করা (Reuse)

আমরা অনেক সময় এমন জিনিস ফেলে দিই, যা আবার ব্যবহার করা যায়। যেমন– পানির খালি বোতল ফেলে না দিয়ে তাতে চারা গাছ লাগানো যায়, মশলা রাখার পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়, কলম রাখার পাত্রও বানানো যায়। একপাশে ব্যবহৃত কাগজের উল্টাপাশে ছবি আঁকা যায়। পুরানো জামা কেটে ঘর মোছার কাপড় বানানো যায়। এভাবে জিনিসপত্র পুনরায় ব্যবহার করলে বর্জ্য কমে এবং পরিবেশ পরিষ্কার থাকে।

পুনঃপ্রক্রিয়া (Recycle) করার জন্য সংরক্ষণ করা

এমন অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা সচরাচর পুনরায় ব্যবহার করতে পারি না। এগুলোকে যদি আমরা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করি এবং রিসাইকেল করি, তবে এ পদার্থগুলো পুনরায় নতুন কোনো জিনিস তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন– টিন, প্লাস্টিক, কাচ, কাগজ ইত্যাদি রিসাইকেল করে নতুন দ্রব্য উৎপন্ন করা যায়। তার ফলে পরিবেশের ক্ষতি অনেকখানি কমে যেতে পারে।

জৈব সার তৈরি বা কম্পোস্টিং (Composting)

রান্নাঘরে শাক-সবজি, মাছ-মাংস কাটার পর প্রচুর আবর্জনা তৈরি হয়। এই আবর্জনাগুলোকে যদি আমরা সঠিকভাবে মাটির নিচে পুঁতে রাখি, তবে এগুলো পচে গিয়ে জৈব সারে পরিণত হয়। এই জৈব সার ফসল ফলানোর জন্য ব্যবহার করা যায়।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দিই

ক) কোন অবস্থায় অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ শক্তি সবচেয়ে শক্তিশালি হয়?

☐ মিশ্রণ ☐ কঠিন পদার্থ ☐ তরল পদার্থ ☐ গ্যাসীয় পদার্থ

খ) পানির কঠিন অবস্থা কোনটি?

☐ পানি ☐ বরফ ☐ জলীয়বাষ্প ☐ শিশির

গ) শরবত থেকে চিনি পৃথক করার জন্য কোনটি ব্যবহার করবে?

☐ বাতাস ☐ চুম্বক ☐ ছাঁকনি ☐ তাপ

ঘ) কোনো দ্রব্য ব্যবহারের পর ফেলে না দিয়ে পুনর্ব্যবহার করলে–

☐ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয় ☐ পরিবেশ ভালো থাকে

☐ পরিবেশ নষ্ট হয় ☐ সময় নষ্ট হয়

২. শূন্যস্থান পূরণ করি

ক. হাইড্রোজেনের একটি অণুতে .... পরমাণু থাকে।

খ. পদার্থের .... অবস্থায় অণুসমূহ সবচেয়ে দূরে দূরে থাকে।

গ. পানি খাওয়ার জন্য নিরাপদ করতে .... ব্যবহার করি।

ঘ. পানির একটি অণুতে .... হাইড্রোজেন পরমাণু আছে।

৩. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক. পানির অবস্থা কয়টি? তাদের নাম কী কী?

খ. পরমাণু ও অণুর মধ্যে দুইটি পার্থক্য লেখো।

গ. পদার্থের তরল অবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৪. বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক. অণুর ধারণায় পদার্থের তিন অবস্থা ব্যাখ্যা করো।

খ. বাসাবাড়ির বর্জ্য পদার্থ থেকে পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্য কী কী করা যায়?

গ. চিনির শরবতে ময়লা থাকলে সেই মিশ্রণ থেকে উপাদানসমূহ কীভাবে আলাদা করা যায়?

অধ্যায় ৬

শক্তির রূপান্তর

পূর্ববর্তী শ্রেণিগুলোতে আমরা শক্তির ধারণা ও এর বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে জেনেছি। এই শ্রেণিতে আমরা শক্তির রূপান্তর সম্পর্কে জানব। শক্তি হলো কাজ করার সামর্থ্য। খেলাধুলা থেকে শুরু করে গৃহস্থালির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য এটি অপরিহার্য। শক্তি ছাড়া কোনো বস্তু নড়াচড়া করে না, বা বস্তুটি কাজ সম্পাদন করে না। এই অধ্যায়ে আমরা শক্তির রূপান্তর ও শক্তি সঞ্চালন সম্পর্কে জানব।

১. বিভিন্ন ঘটনা ও কাজে শক্তির রূপান্তর

চতুর্থ শ্রেণিতে আমরা শক্তির বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে জেনেছি। শক্তির রূপগুলো হলো তাপশক্তি, আলোকশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, শব্দশক্তি, রাসায়নিক শক্তি, গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি। শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হতে পারে। শক্তির রূপের এই পরিবর্তনই হলো শক্তির রূপান্তর।

? শক্তির রূপান্তর কীভাবে ঘটে?

কাজ: শক্তির রূপান্তর পর্যবেক্ষণ

চিত্র: ১

চিত্র: ২

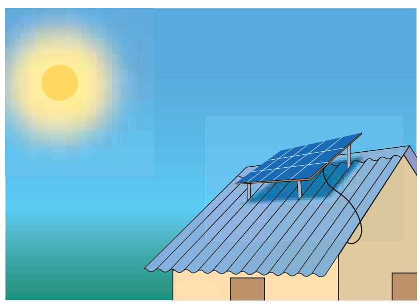

চিত্র: ৩

চিত্র: ৪

চিত্র: ৫

চিত্র: ৬

যা করতে হবে:

১. উপরের ছবিগুলোতে সূর্য থেকে পাওয়া শক্তির বিভিন্ন রূপগুলো ভালোভাবে লক্ষ করি।

২. ছবির ক্রমিক নম্বর অনুসারে শক্তির রূপ ধারণাচিত্রে লেখো।

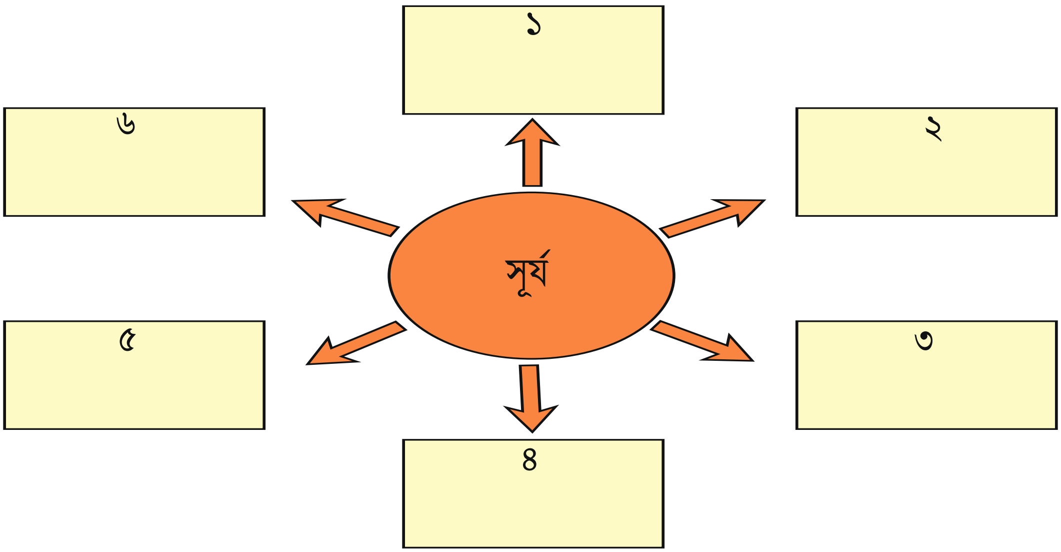

সারসংক্ষেপ

সূর্য আমাদের শক্তির প্রধান উৎস। শক্তির বিভিন্ন রূপ রয়েছে। সূর্য থেকে পাওয়া শক্তি হলো সৌরশক্তি। আমরা সরাসরি আলো ও তাপ হিসেবে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করি। এই শক্তি আবার গতিশক্তি, তাপশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, রাসায়নিক শক্তি ও আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

দৈনন্দিন বিভিন্ন ঘটনা ও কাজে শক্তির রূপান্তর সম্পর্কে আরও কিছু জানি

শক্তির রূপান্তর হচ্ছে শক্তির এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। এই ধরনের প্রক্রিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ই ঘটে। ফলে আমরা বিভিন্ন কাজ খুব সহজভাবে করতে পারি। চলো, আমরা আমাদের বাড়ি ও পরিচিত পরিবেশে শক্তির রূপান্তরের কিছু ঘটনা সম্পর্কে জানি।

বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি

শক্তির রূপান্তর : বৈদ্যুতিক শক্তি —> তাপশক্তি

বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি দিয়ে কাপড় ইস্ত্রি করার সময় বৈদ্যুতিকশক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে ইস্ত্রি দিয়ে তাপ ও চাপের সাহায্যে কাপড়ের ভাঁজকে মুছে ফেলা যায়।

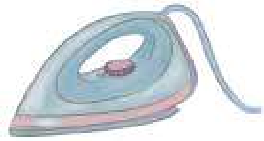

বৈদ্যুতিক পাখা

শক্তির রূপান্তর : বৈদ্যুতিক শক্তি—> যান্ত্রিক শক্তি

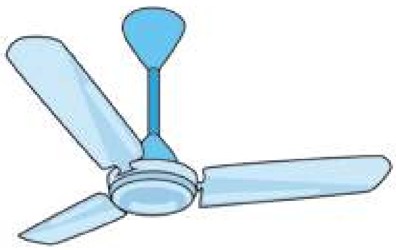

বৈদ্যুতিকশক্তি একটি বৈদ্যুতিক পাখার মাধ্যমে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যার ফলে পাখা ঘুরে। এতে ঘরের চারপাশে বায়ু চলাচল করে, একটি শীতল অবস্থা তৈরি হয়। **যান্ত্রিকশক্তি** হলো কোনো বস্তুর স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তির যোগফল। অর্থাৎ বস্তুর অবস্থান এবং গতি উভয়ের কারণে যে শক্তি থাকে তাকে যান্ত্রিকশক্তি বলে।

ব্যাটারি

শক্তির রূপান্তর : রাসায়নিক শক্তি —> বিদ্যুৎ, আলোক ও শব্দশক্তি

ব্যাটারির রাসায়নিক শক্তি বৈদ্যুতিকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তিকালে বৈদ্যুতিকশক্তি বাল্বের মাধ্যমে আলোকশক্তিতে এবং কলিংবেলের মাধ্যমে শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

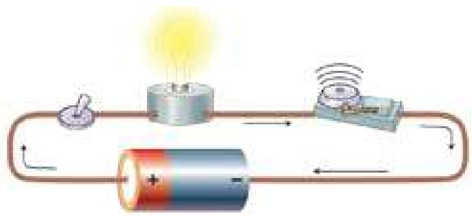

বৈদ্যুতিক বাতি

শক্তির রূপান্তর : বৈদ্যুতিকশক্তি —> আলোকশক্তি ও তাপশক্তি

বৈদ্যুতিকশক্তি আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের ঘর আলোকিত করে। এই প্রক্রিয়ায় কিছু শক্তি তাপশক্তিতেও রূপান্তরিত হয়।

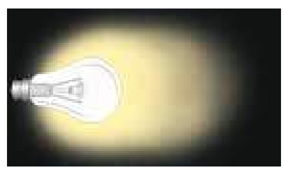

সোলার প্যানেল

শক্তির রূপান্তর : সৌরশক্তি —> বৈদ্যুতিকশক্তি

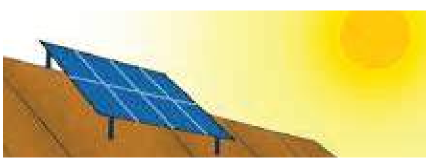

সৌরশক্তি সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বৈদ্যুতিকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই শক্তি আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি।

চুলায় রান্না

শক্তির রূপান্তর : রাসায়নিক শক্তি (কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল) —> তাপ ও আলোকশক্তি

কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল জাতীয় পদার্থে থাকা রাসায়নিক শক্তি চুলার মাধ্যমে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে আমরা তাপশক্তি ব্যবহার করে রান্না করতে পারি।

টেলিভিশন

শক্তির রূপান্তর : বৈদ্যুতিকশক্তি —> আলোকশক্তি ও শব্দশক্তি

টেলিভিশনে বৈদ্যুতিকশক্তি আলোকশক্তি এবং শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আলোকশক্তির মাধ্যমে আমরা ছবি দেখতে পাই। শব্দশক্তির মাধ্যমে আমরা কথা গান ও অন্যান্য শব্দ শুনতে পারি।

কাজ: শক্তির রূপান্তরের পরীক্ষা

যা প্রয়োজন: একটি টর্চলাইটের ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক তার, ছোটো বাল্ব

যা করতে হবে:

১. ব্যাটারির দুইপাশে তার যুক্ত করি।

২. ব্যাটারিতে যুক্ত তার একটি ছোটো বাল্বের সাথে যুক্ত করি এবং কী ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করি।

৩. কিছুক্ষণ পর ব্যাটারি থেকে তারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বাল্বটি হাতে স্পর্শ করে দেখি।

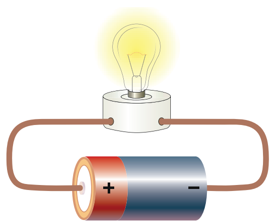

ফলাফল

আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম যে, ব্যাটারির দুই প্রান্তে যুক্ত তার বাল্বের সাথে যুক্ত করার পর বাল্বটি জ্বলে উঠল। বাল্বটি হাত দিয়ে স্পর্শ করলে গরম অনুভূত হয়। নিচের ফাঁকা ঘরগুলোতে এই পরীক্ষার শক্তির রূপান্তরের ধাপগুলো লিখি।

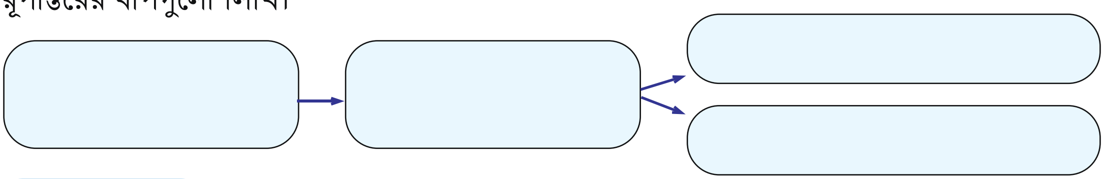

সারসংক্ষেপ

শক্তির রূপান্তরের পরীক্ষাটিতে ব্যাটারিতে থাকা রাসায়নিক শক্তি রূপান্তরিত হয়ে বৈদ্যুতিকশক্তিতে পরিণত হয়। এই শক্তি পরবর্তীতে আলোকশক্তি ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

২. তাপ সঞ্চালনের বিভিন্ন উপায়

তাপ কীভাবে সঞ্চালিত হয়?

তাপ সব সময় গরম জায়গা থেকে ঠান্ডা জায়গায় সঞ্চালিত হয়। তাপের একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার প্রক্রিয়াই হলো তাপ সঞ্চালন। যেমন আমরা যখন গরম চায়ের কাপ ধরি, তখন কাপের তাপ হাতে অনুভব করি। চুলার উপর হাঁড়ির পানিতে তাপ দিলে নিচের পানি উপরে ওঠে আসে। আবার রোদে দাঁড়ালে শরীরে গরম অনুভব করি। এই সবকিছুই তাপ সঞ্চালনের বিভিন্ন উপায়। তাপ এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে কখনো কোনো বস্তু বা মাধ্যম লাগে, আবার কখনো কোনো মাধ্যম লাগে না।

কাজ: বিভিন্ন উপায়ে তাপ সঞ্চালন পর্যবেক্ষণ

পরীক্ষণ ১: পরিবহণ পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালন

যা প্রয়োজন: একটি ধাতব চামচ, একটি কাপ, গরম পানি, কিছু মোম (বা ছোটো মোমবাতির টুকরা)

যা করতে হবে:

১. ধাতব চামচের এক প্রান্তে মোমের ছোটো একটি টুকরা লাগাই।
২. চামচটির অন্য প্রান্ত গরম পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখি।
৩. কিছুক্ষণ পর মোমের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি।
৪. পর্যবেক্ষণের আলোকে নিচের ছকটি পূরণ করি।

⚠ পরীক্ষণটি শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে করি।

ধাতব চামচের প্রান্তে লাগানো মোমটি গলে গিয়েছে না স্বাভাবিক আছে? যদি গলে গিয়ে থাকে তাহলে কেন এমন হলো—দলে আলোচনা করে মতামত লিখি।

সারসংক্ষেপ

কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপের সঞ্চালন হলো পরিবহণ। **পরীক্ষণ ১-** এ তাপ গরম পানি থেকে ধাতব চামচের মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়ে মোমকে গলিয়েছে।

তাপ সঞ্চালনের পরিবহণ পদ্ধতি সম্পর্কে আরও কিছু জানি

পরিবহণ: কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সঞ্চালিত হয় পরিবহণ পদ্ধতিতে। গরম পানিতে ধাতব চামচ রাখার বিষয়টি নিয়ে ভাবি। খুব তাড়াতাড়ি চামচের হাতল গরম হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে গরম পানি থেকে তাপ সঞ্চালিত হয়ে চামচের গরম অংশ থেকে ঠান্ডা অংশে সঞ্চালিত হয়। চামচ তাপের পরিবাহী হিসেবে কাজ করে। পরিবহণ পদ্ধতিতে পদার্থের অণুগুলো তাদের নিজস্ব স্থান পরিবর্তন করে না। পদার্থের অণুগুলো স্পন্দনের মাধ্যমে এক অণু তার পার্শ্ববর্তী অণুকে তাপ প্রদান করে। এর ফলে পদার্থের উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে তাপ সঞ্চালিত হয়।

পরীক্ষণ ২: পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালন

যা প্রয়োজন: একটি স্বচ্ছ বড়ো বিকার, পানি, দানাদার রং এবং মোমবাতি বা বার্নার।

যা করতে হবে:

১. বিকারটিতে ঠান্ডা পানি ঢালি।

২. বিকারের মধ্যে পানিতে দানাদার রং রাখি, যাতে রং পানির তলায় জমা হয়।

৩. বিকারটিকে সাবধানে মোমবাতি বা বার্নারের উপর রেখে তাপ দিই।

৪. বিকারের রঙিন পানির গতিবিধি লক্ষ করি।

৫. পর্যবেক্ষণের আলোকে নিচের ছকটি পূরণ করি।

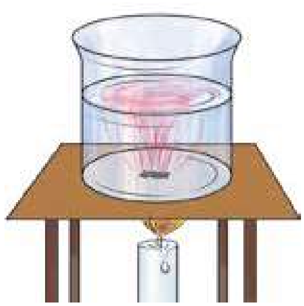

⚠ পরীক্ষণটি শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে করি।

বিকারের উপরের দিকের পানিতে রং দেখা যাচ্ছে কি? যদি দেখা যায়, কেন এমন হলো তা দলে আলোচনা করে মতামত দিই।

সারসংক্ষেপ

তরল মাধ্যমে তাপ পরিচলন পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয়। **পরীক্ষণ ২- এ** তাপ বিকারের নিচ থেকে পানির মাধ্যমে জারের সর্বত্র সঞ্চালিত হয়েছে।

তাপ সঞ্চালনের পরিচলন পদ্ধতি সম্পর্কে আরও কিছু জানি

পরিচলন: তরল ও বায়বীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ পরিচলন পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয়। আমরা যখন একটি পাত্রে পানি গরম করি তখন নিচ থেকে পানি উপরের দিকে উঠে আসে। পাত্রের উপরের দিকের শীতল পানি নিচে নেমে আসে, ফলে পানির একটি বৃত্তাকার গতিপথ সৃষ্টি হয়। এভাবে তাপ পানির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ কোনো পদার্থের অণুগুলোর চলাচলের দ্বারা উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে সঞ্চালিত হয়।

পরীক্ষণ ৩: বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালন

যা প্রয়োজন: একটি পানির পাত্র, থার্মোমিটার, একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব।

যা করতে হবে:

১. পানির পাত্রে অল্প পরিমাণ পানি ঢালি।
২. থার্মোমিটারে পানির তাপমাত্রা মাপি।
৩. পানি থেকে কিছুটা উপরে একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব কিছুক্ষণ জ্বালিয়ে রাখি।
৪. কিছুক্ষণ পর আবার পানির তাপমাত্রা মাপি।

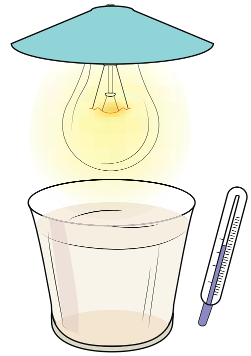

⚠ পরীক্ষণটি শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে করি।

৫. পর্যবেক্ষণের আলোকে নিচের ছকটি পূরণ করি।

পাত্রের পানির তাপমাত্রা কেন ও কীভাবে বাড়ল? দলে আলোচনা করে তোমার মতামত দাও।

সারসংক্ষেপ

উৎস হতে কোনো মাধ্যম ছাড়া তাপ সঞ্চালন পদ্ধতি হলো বিকিরণ। **পরীক্ষণ** ৩-এ বাল্ব হতে তাপ কোনো মাধ্যম ছাড়াই পানিতে সঞ্চালিত হয়েছে।

তাপ সঞ্চালনের বিকিরণ পদ্ধতি সম্পর্কে আরও কিছু জানি

বিকিরণ: তাপ যে প্রক্রিয়ায় কোনো উৎস হতে মাধ্যম ছাড়াই সঞ্চালিত হয় তাই বিকিরণ। আমরা সূর্যের আলোতে দাঁড়ালে উষ্ণতা অনুভব করি। কারণ সূর্যের তাপ শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে বিকিরণ পদ্ধতিতে আমাদের কাছে আসে।

৩. বিভিন্ন ঘটনা ও কাজে তাপ সঞ্চালন

আমরা প্রতিদিনের জীবনে এমন অনেক কাজ করি যেখানে তাপ ব্যবহার হয়। কেউ যখন চুলায় রান্না করেন, কাপড় ইস্ত্রি করেন, বা রোদে ধান শুকানো হয়– সবখানেই তাপের ব্যবহার দেখা যায়। রোদে রাখা ভেজা কাপড় গরম হয়ে শুকিয়ে যায়, আবার শীতের সকালে আগুন পোহাতে গিয়ে আমরা গরম অনুভব করি। এইসব ঘটনাই তাপ সঞ্চালনের ফল। আমাদের চারপাশের পরিচিত কাজ ও ঘটনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাপ কীভাবে সঞ্চালিত হয় তা আমরা সহজেই জানতে পারি।

? বিভিন্ন কাজ বা ঘটনায় কীভাবে তাপের সঞ্চালন ঘটে?

কাজ: বিভিন্ন ঘটনা ও কাজে তাপ সঞ্চালনের উপায়গুলো খুঁজে বের করা

চিত্র: ১

চিত্র: ২

চিত্র: ৩

চিত্র: ৪

চিত্র: ৫

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

চিত্র: ৬

যা করতে হবে:

১. উপরের ছবিগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি।
২. ছবিগুলোতে কী উপায়ে তাপ সঞ্চালন হচ্ছে ও এর পেছনের কারণগুলো নিয়ে চিন্তা করি।
৩. পাশের সহপাঠীদের সাথে ছবিগুলোতে দেখানো তাপ সঞ্চালন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করি।
৪. নিচের ছকে ছবির ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী তাপ সঞ্চালনের পদ্ধতি ও তার কারণ লিখি।

ছবির নম্বর	তাপ সঞ্চালন পদ্ধতি	কারণ
চিত্র- ১		
চিত্র- ২		
চিত্র- ৩		
চিত্র- ৪		
চিত্র- ৫		
চিত্র- ৬		

সারসংক্ষেপ

আমাদের পরিচিত পরিবেশে বিভিন্ন ঘটনায় ও কাজে পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ এই তিনটি পদ্ধতির কোনো না কোনো একটি পদ্ধতিতে তাপের সঞ্চালন ঘটে।

৪. আলো সঞ্চালন

শক্তির একটি রূপ হলো আলো, যা আমাদের চারপাশের জগৎকে দেখতে সাহায্যে করে। এটি বিভিন্ন উৎস থেকে আসে, যেমন–তারা, সূর্য, বৈদ্যুতিক বাতি ইত্যাদি। এমনকি আমরা জোনাকি পোকা থেকেও আলো পাই। আলো আমাদের চারপাশের পরিবেশ বুঝতে এবং অনুভব করতে সহায়তা করে।

আলো কীভাবে সঞ্চালিত হয়?

কাজ: আলো চলার পথ পর্যবেক্ষণ

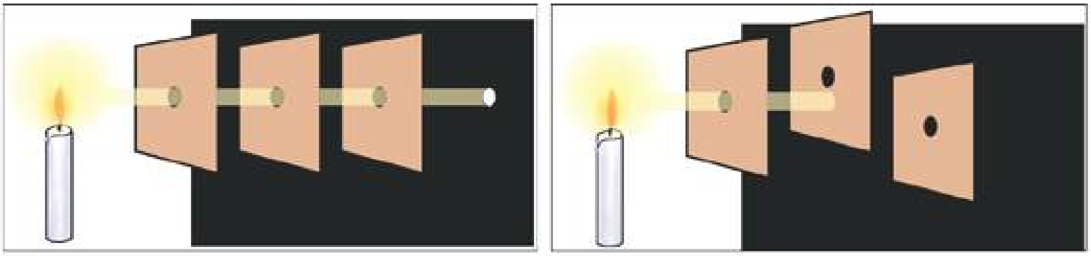

যা প্রয়োজন: মোমবাতি, তিনটি শক্ত কাগজের টুকরা যেগুলোর কেন্দ্রে একই ব্যাসার্ধের ছিদ্র থাকবে।

যা করতে হবে:

১. শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী কয়েকটি দলে ভাগ হই।
২. কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নিই।
৩. প্রতিটি দল শিক্ষকের সহায়তায় টেবিলের উপর একটি মোমবাতি জ্বালাই।
৪. মোমবাতির সামনে পর পর তিনটি শক্ত কাগজের টুকরা রাখি।
৫. শক্ত কাগজের টুকরাগুলোর ছিদ্র যেন একই সরল রেখায় থাকে তা নিশ্চিত করি।
৬. মোমবাতির অপর প্রান্ত থেকে কাগজের টুকরার ছিদ্র দিয়ে আলো দেখার চেষ্টা করি।
৭. শক্ত কাগজের টুকরা একটু ডানে-বামে সরিয়ে নিই, এতে শক্ত কাগজের টুকরাগুলোর ছিদ্র একই সরল রেখায় থাকবে না।
৮. মোমবাতির অপর প্রান্ত থেকে মোমবাতির আলো দেখার চেষ্টা করি।
৯. পর্যবেক্ষণ দুটিতে কী ঘটে তা নিচের ছকে লিখি।

পরীক্ষণ	পর্যবেক্ষণ
যখন শক্ত কাগজের টুকরাগুলোর ছিদ্র একই সরল রেখায় থাকে।	
যখন শক্ত কাগজের টুকরাগুলোর ছিদ্র একই সরল রেখায় থাকে না।	

সারসংক্ষেপ

এই পরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, আলো সব সময় সোজা পথে চলে। যখন মোমবাতির সামনে রাখা তিনটি কাগজের ছিদ্র একই সরল রেখায় থাকে, তখন আমরা মোমবাতির আলো পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই। কিন্তু যখন কাগজের ছিদ্রগুলো একটু ডানে-বামে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন আর আলো দেখা যায় না। এটি প্রমাণ করে যে, আলো সোজা পথে চলাচল করে।

আলোর সঞ্চালন সম্পর্কে আরও কিছু জানি

আলো হলো এক ধরনের শক্তি, যা আমাদের চারপাশ দেখতে সাহায্য করে। আলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সঞ্চালিত হয়, আর এই সঞ্চালনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সরলরেখায় চলা।

অর্থাৎ আলো সব সময় সোজা পথে চলে। তাই মোমবাতি বা টর্চ জ্বালালে আলো সোজা পথে চোখে আসে এবং সামনে কোনো বস্তু রাখলে পেছনে ছায়া পড়ে। আলোর সঞ্চালনে কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। সূর্যের আলো মহাকাশ পেরিয়ে পৃথিবীতে আসে। মহাকাশে কোনো বায়ু বা অন্য কোনো পদার্থ নেই; তবুও আলো আসে। এইভাবে আলো যখন কোনো মাধ্যম ছাড়া সঞ্চালিত হয়, তখন তাকে বলে বিকিরণ পদ্ধতি। যদিও সূর্য আমাদের থেকে অনেক দূরে, বিকিরণ পদ্ধতিতে সূর্যের আলো সঞ্চালনের কারণেই আমরা সূর্যের আলো ও তাপ অনুভব করতে পারি। বিভিন্ন পদার্থের মধ্য দিয়ে আলো সঞ্চালন প্রক্রিয়ার ভিন্নতা আছে।

৫. শক্তির যথাযথ ব্যবহার, পুনর্ব্যবহার ও সংরক্ষণ

আমাদের চারপাশের পরিবেশে চলাফেরা, আলো জ্বালানো, রান্না করা, গাড়ি চালানো, যন্ত্র ব্যবহারসহ নানা কাজে শক্তির প্রয়োজন হয়। শক্তি ছাড়া দৈনন্দিন জীবন কল্পনা করা যায় না। এই শক্তি কখনো বিদ্যুৎ থেকে আসে, কখনো জ্বালানি থেকে, আবার কখনো সূর্যের আলো থেকেও পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা যদি শক্তি অতিরিক্ত ব্যবহার করি কিংবা অপচয় করি, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের জন্য শক্তির সংকট তৈরি হতে পারে। শক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা শক্তির অপচয় রোধ করে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে পারি। তাই আমাদের উচিত নিজের পরিবেশেই শক্তি সাশ্রয় করার অভ্যাস গড়ে তোলা। এসো জেনে নিই, কীভাবে আমরা বাসা, বিদ্যালয় বা আশপাশের পরিবেশে শক্তি র যথাযথ ব্যবহার, পুনর্ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে পারি।

আমরা কীভাবে শক্তির যথাযথ ব্যবহার, পুনর্ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে পারি?

কাজ: আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্র খুঁজে বের করা

যা করতে হবে:

সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয়, বাড়ি ও অন্যান্য স্থানে কোন কোন কাজে কী কী শক্তির অপব্যবহার হয় তা চিহ্নিত করি এবং সংরক্ষণের উপায় লিখি।

শক্তি	অপব্যবহার	সংরক্ষণের উপায়

সারসংক্ষেপ

দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন রকম কাজ করার জন্য আলোকশক্তি, তাপশক্তি, বৈদ্যুতিকশক্তি, যান্ত্রিকশক্তি, শব্দশক্তি, রাসায়নিক শক্তি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি। শক্তির যথাযথ ও দায়িত্বশীল ব্যবহার করে শক্তির অপচয় কমিয়ে এবং পুনর্ব্যবহার করে আমরা শক্তি সংরক্ষণ করতে পারি।

শক্তির যথাযথ ব্যবহার, পুনর্ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আরও জানি

শক্তি আমাদের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। আমরা প্রতিদিন বাড়ি, বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র, পরিবহণ, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে শক্তি ব্যবহার করি। প্রকৃতিতে মানুষের জন্য শক্তি প্রদানকারী অনবায়নযোগ্য সম্পদ সীমিত। এজন্য শক্তির যথাযথ ব্যবহারে মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য শক্তি সংরক্ষণ করতে হবে।

শক্তির পুনর্ব্যবহার মানে হলো একই শক্তিকে বারবার কাজে লাগানো, অথবা এক কাজে ব্যবহৃত শক্তি কে আরও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা। শক্তির পুনর্ব্যবহার করলে শক্তি সংরক্ষণ করা যায়, পরিবেশ দূষণ কমে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যবহারের জন্য শক্তি রক্ষা করা যায়। শক্তির পুনর্ব্যবহারের উদাহরণ হলো- রান্না শেষ করার পর চুলার উত্তাপ ব্যবহার করে পানি গরম করা। কারখানার গরম ধোঁয়া ব্যবহার করে পানি ফুটিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। এছাড়া গাড়ির উচ্চগতির ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা দিয়ে ব্যাটারি চার্জ করে পুনরায় ব্যবহার করা। সৌরশক্তি ব্যবহার করে ব্যাটারি চার্জ দিয়ে বিভিন্ন কাজ করা।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করি

ক) শক্তি হলো কাজ করার .... ।

খ) যান্ত্রিক শক্তি হলো .... শক্তির যোগফল।

গ) তাপের চলার প্রক্রিয়াই হলো ....।

ঘ) কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সঞ্চালিত হয় .... পদ্ধতিতে।

২। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নির্বাচন করি।

	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
তাল পাতার তৈরি চরকি বাতাসের সাহায্যে ঘুরানোর সময় তাপশক্তি ব্যবহৃত হয়।		
খাবার, জ্বালানি তেল, কয়লা ইত্যাদি রাসায়নিক শক্তির উৎস।		
পরিচলন পদ্ধতিতে তরল ও বায়বীয় মাধ্যমে তাপের সঞ্চালন হয়।		
সূর্য থেকে পরিবহণ পদ্ধতিতে পৃথিবীতে আলো আসে।		
শক্তির পুনর্ব্যবহার করলে শক্তি সংরক্ষণ করা যায়।		

৩। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক. শক্তির বিভিন্ন রূপের নাম লেখো।

খ. আলো সঞ্চালনে মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না– এই বিষয়টি আমরা কীভাবে বুঝতে পারি?

গ. বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে শক্তির কী রূপান্তর ঘটে?

ঘ. কীভাবে বাসায় শক্তির অপচয় কমানো যায়? কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৪। বর্ণনামূলক উত্তর প্রশ্ন

ক. ‘সূর্য শক্তির প্রধান উৎস’– এই কথাটি ব্যাখ্যা করো।

খ. আলো সোজা পথে চলে এই বিষয়টি পরীক্ষণের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

গ. বাড়িতে আমরা কোন কাজে কোন শক্তি ব্যবহার করে থাকি, তা ছকে উপস্থাপন করো।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

অধ্যায় ৭

বলের ধারণা

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে আমরা বল প্রয়োগ করে থাকি। আমরা নানাভাবে বিভিন্ন বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করে থাকি। আমরা জানি টান ও ঠেলা হলো বল প্রয়োগের দুটি মাধ্যম। বস্তুর আকার, আকৃতি ও গতি পরিবর্তনে বলের প্রভাব রয়েছে। যন্ত্র ব্যবহার করে বল প্রয়োগ করলে যেকোনো কাজ আরও সহজ হয়।

১. বস্তুর ওপর বিভিন্ন মাত্রার বলের কার্যকারিতা

? বস্তুর ওপর বিভিন্ন মাত্রার বল প্রয়োগে কী ঘটে?

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে আমরা বল প্রয়োগ করে থাকি। যেমন– দরজা খোলা ও বন্ধ করা, ঠেলাগাড়ি টানা, টেবিল-চেয়ার সরানো ইত্যাদি। এসকল ঘটনায় বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

কাজ: বিভিন্ন মাত্রায় বল প্রয়োগ করে বলের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ।

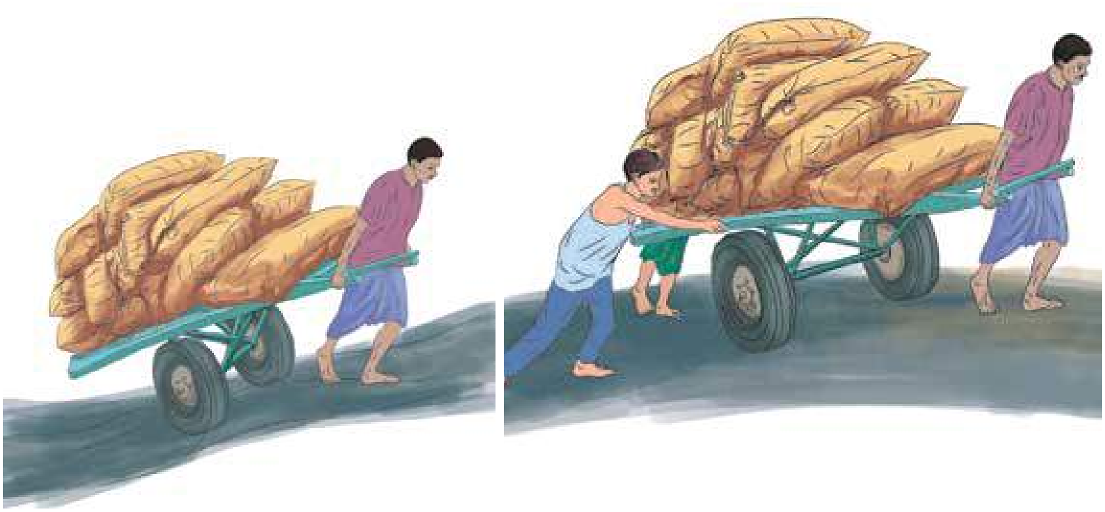

পর্যবেক্ষণ- ১

উপরের ছবি দুটি ভালো করে লক্ষ করি। প্রথম ছবিটিতে চালক ঠেলাগাড়িটি নিচু স্থান থেকে উঁচু স্থানে উঠাতে পরছে না। দ্বিতীয় ছবিতে চালককে গাড়ির পেছন থেকে তার দুই বন্ধু ঠেলা দিয়ে সাহায্য করে মালবাহী ঠেলাগাড়িটিকে উঁচু জায়গায় তুলে দিয়েছে। চালকের একা একা গাড়ি টানা এবং তার বন্ধুরা

তাকে সাহায্যে করার ফলে যে ভিন্ন ফলাফল হলো তার কারণগুলো নিচের ছকে লিখি।

পর্যবেক্ষণ	কারণ
চালক একা চেষ্টা করে কেন গাড়িটি উঠাতে পারছিল না?	
পেছন থেকে চালকের বন্ধুরা ঠেলা দেওয়ায় কেন গাড়িটি উঠানো সম্ভব হলো?	

কারণগুলো সহপাঠীদের সাথে মিলিয়ে দেখি এবং আলোচনা করি।

পর্যবেক্ষণ- ২

১. কয়েকজন সহপাঠী মিলে শ্রেণিকক্ষে একটি ভারী টেবিলকে সরানোর চেষ্টা করি।

২. প্রথমবার চেষ্টায় একজন শিক্ষার্থী ঠেলা দিয়ে টেবিল সরানোর চেষ্টা করি, এরপর দুইজন মিলে একসাথে টেবিলটিকে ঠেলা দিই। শেষে কয়েকজন মিলে একসাথে টেবিলটিকে ঠেলা দিই। নিচের ছকে ফলাফল হলো তা লিখি।

প্রচেষ্টার ধাপ	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ফলাফল	কারণ (টেবিল সরানোর জন্য বল প্রয়োগের মাত্রা)
প্রথম চেষ্টা	১ জন		
দ্বিতীয় চেষ্টা	২ জন		
তৃতীয় চেষ্টা	কয়েকজন (৩ বা তার বেশি)		

৩. সহপাঠীদের সাথে প্রাপ্ত ফলাফল মিলিয়ে নিই। প্রাপ্ত ফলাফলের কারণগুলো নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

সারসংক্ষেপ

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা বিভিন্ন কাজকর্ম করার সময় বল প্রয়োগ করি। বল প্রয়োগের দুটি প্রধান পদ্ধতি হলো টান ও ঠেলা। বল প্রয়োগ করে বস্তু সরানো যায় এবং বস্তুর আকার, আকৃতি ও গতির পরিবর্তন করা যায়। বলের মাত্রা বাড়ালে বস্তু দ্রুত ও বেশি দূর যেতে পারে। তাই বলের কার্যকারিতা নির্ভর করে তার পরিমাণ ও প্রয়োগের কৌশলের ওপর।

বস্তুর ওপর বিভিন্ন মাত্রার বলের কার্যকারিতা সম্পর্কে আরও কিছু জানি

আমরা যখন সাইকেল চালাই তখন সাইকেলের প্যাডেলে বল প্রয়োগ করি। যদি প্যাডেলে কম মাত্রায় বল প্রয়োগ করি তাহলে সাইকেল কম গতিতে চলে। যদি প্যাডেলে বেশি মাত্রায় বল প্রয়োগ করি তাহলে সাইকেল বেশি গতিতে চলে। অর্থাৎ বিভিন্ন মাত্রায় বল প্রয়োগে সাইকেলের গতি কম বেশি হয়।

আবার আমরা যখন ফুটবল খেলি তখন যে মাত্রায় বল প্রয়োগ করি তার ওপর ফুটবলের গতি নির্ভর করে। অর্থাৎ ফুটবলে আস্তে লাথি দিলে কম দূরত্ব অতিক্রম করে। জোরে লাথি দিলে অতি দ্রুত বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে।

বলের মাত্রা

বল প্রয়োগের শক্তি বা জোরকে বলের 'মাত্রা' বলা হয়। বিভিন্ন মাত্রার বল প্রয়োগ বস্তুর গতি, দিক ও দূরত্বে ভিন্ন প্রভাব ফেলে। বলের মাত্রা যত বেশি, বস্তুর ওপর প্রভাব তত বেশি। আমরা জানি, বল প্রয়োগ করার মাধ্যমে কোনো বস্তুকে সরানো, গতি বাড়ানো, কমানো বা থামানো যায়। কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক মাত্রার বল প্রয়োগ করলে কাজ সহজ হয় ও সময় বাঁচে।

২. বস্তুর ওপর ঘর্ষণ বলের প্রভাব

খেলতে গিয়ে মাটির উপর মার্বেল গড়িয়ে দিলে দেখা যায়, কিছু সময় পর মার্বেল থেমে যায়। কোনো বস্তু টানতে অনেক কষ্ট হয়; আবার কোনো বস্তুকে সহজেই টানা যায়। কেন এমন হয়? এসব ঘটনার পেছনে অন্যতম কারণ হলো ঘর্ষণ বল।

? বস্তুর ওপর ঘর্ষণ বল কী প্রভাব ফেলে?

কাজ: বস্তুর ওপর ঘর্ষণ বলের প্রভাব পর্যবেক্ষণ।

যা করতে হবে:

১. একটি খেলার বলকে বিদ্যালয়ের মসৃণ মেঝে এবং স্কুলের মাঠে ঘাসের উপর দিয়ে গড়িয়ে দিই।

২. কোন ক্ষেত্রে খেলার বলটি বেশি দূরত্ব অতিক্রম করল তা পর্যবেক্ষণ করে এর কারণ লিখি।

প্রচেষ্টা	পর্যবেক্ষণের ফলাফল ও তার কারণ
খেলার বল বিদ্যালয়ের মসৃণ মেঝেতে গড়িয়ে দেওয়া	
খেলার বল খেলার মাঠে ঘাসের উপর দিয়ে গড়িয়ে দেওয়া	

সারসংক্ষেপ

বস্তুকে কোনো কিছুর উপর দিয়ে গড়িয়ে দিলে একটু পরে থেমে যায়। এই থেমে যাওয়ার কারণ হলো ঘর্ষণ বল। ঘর্ষণ বল হলো এমন একটি বল, যা একটি বস্তুর পৃষ্ঠের উপর দিয়ে অপর একটি বস্তুর পৃষ্ঠকে চলতে বাধা দেয়।

বস্তুর ওপর ঘর্ষণ বলের প্রভাব সম্পর্কে আরও কিছু জানি

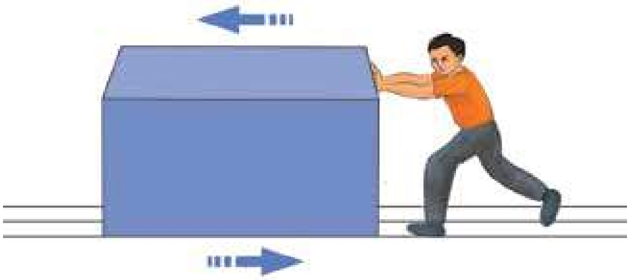

যখন কোনো বস্তু অন্য কোনো বস্তুর উপর দিয়ে চলতে থাকে তখন বস্তু দুটির স্পর্শের জায়গায় গতির বিরুদ্ধে বল তৈরি হয়। এ ঘর্ষণকে বল বলা হয়। একটি বস্তু যখন আরেকটি বস্তুর উপর দিয়ে গড়িয়ে যায় তখন একটি বস্তুর পৃষ্ঠ যেদিকে সরে যেতে চায় তার বিপরীত দিকে ঘর্ষণ বল কাজ করে। যার কারণে গড়িয়ে যাওয়া বস্তুটির গতি কমে যায়। যদি কোনো বস্তুর উপরের পৃষ্ঠ মসৃণ হয় তাহলে ঘর্ষণ কম হয়। অমসৃণ পৃষ্ঠযুক্ত বস্তু হলে ঘর্ষণ বেড়ে যায়, বস্তু সরাতে বেশি শক্তি লাগে। ঘর্ষণ বলের কারণে আমরা লেখার সময় কলম ধরে রাখতে পারি, বোর্ডে লিখতে পারি, দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতে পারি, হাঁটার সময় পিছলে যাই না। আমরা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারব, চকচকে মসৃণ টাইলসের মেঝেতে হাঁটার চেয়ে অমসৃণ পাকা রাস্তায় হাঁটা অধিকতর সুবিধাজনক। ঘর্ষণ বলের কারণে কোনো বস্তুকে টানতে বা ঠেলতে কষ্ট হয়। আবার ঘর্ষণের জন্য গাড়ির ইঞ্জিনে বেশি জ্বালানি লাগে। বেশি ঘর্ষণ থাকলে যন্ত্রপাতির গতিশীল অংশ অনেক সময় ক্ষয়ে যায়। অনেক সময় তা গরম হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

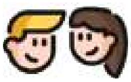

আলোচনা

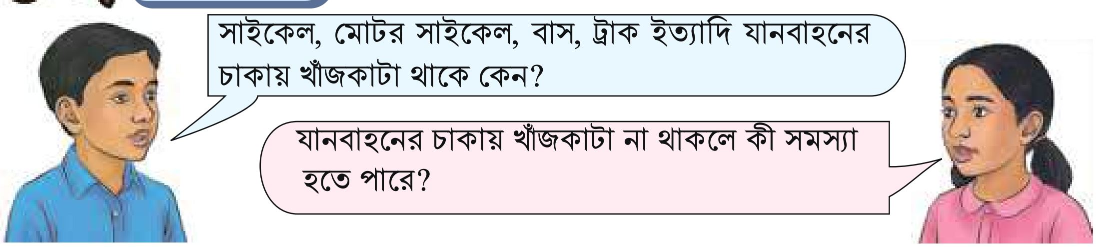

সহপাঠীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দিপু ও জুঁইয়ের প্রশ্ন দুটির উত্তর খুঁজে বের করে নিচের ফাঁকা স্থানে লিখি।

৩. বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল

বিজ্ঞানী নিউটন একদিন আপেল বাগানে গাছের নিচে বসে চিন্তা করছিলেন। তখন হঠাৎ একটি আপেল গাছ থেকে নিচে এসে পড়ল। তখন তার মনে প্রশ্ন জাগল, আপেলটি নিচে পড়ল কেন? কেন উপরের দিকে গেল না? কেনই-বা স্থির হয়ে থাকল না? আমাদের মনে নিশ্চয় একই প্রশ্ন জাগে, সব জিনিস উপর থেকে ছেড়ে দিলে নিচে পড়ে কেন?

? কোনো বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে নিচে পড়ে কেন?

কাজ: বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ পর্যবেক্ষণ।

যা করতে হবে:

১. বল, পেন্সিল, কাগজ, পালক ইত্যাদি হাত উঁচু করে উপর থেকে ছেড়ে দিই।

২. প্রতিক্ষেত্রে কী ঘটে তা লক্ষ করি ও নিচের ছকে লিখি।

বস্তুর নাম	হাত থেকে ছেড়ে দিলে কী ঘটে?
বল, পেন্সিল, কাগজ, পালক	

সারসংক্ষেপ

পৃথিবী সকল বস্তুকে নিজের দিকে টানে। এই টানকে বলা হয় পৃথিবীর আকর্ষণ বল। শুধু বল, পেনসিল, কাগজ বা পালক নয়, যেকোনো বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে তা পৃথিবীর আকর্ষণ বলের কারণে নিচে পড়বে। এই বলকে মাধ্যাকর্ষণ বল বলে।

বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল সম্পর্কে আরও কিছু জানি

আমরা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারব আমরা যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠি তখন কষ্ট হয়। আবার সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় উপরে উঠার তুলনায় কম কষ্ট হয়। এর কারণ হলো পৃথিবীর আকর্ষণ বল। আমরা যখন সিঁড়ি বেয়ে উপর দিকে উঠি তখন পৃথিবীর আকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে কাজ করি, তাই শক্তি বেশি লাগে। আবার যখন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামি তখন

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

পৃথিবীর আকর্ষণ বলের দিকে যাই, তখন মাধ্যাকর্ষণ বল সাহায্য করে। তাই নামা অনেক সহজ হয়। পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে সকল বস্তুকে যে বল দ্বারা আকর্ষণ করে তাই হলো মাধ্যাকর্ষণ বল।

৪. প্রাত্যহিক বিভিন্ন কাজে সরল যন্ত্রের ব্যবহার

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে আমরা অনেক রকম যন্ত্র ব্যবহার করি। এসব যন্ত্র আমাদের কাজকে সহজ করে দেয়। প্রতিদিন আমরা বিভিন্ন কাজে যেসকল সহজ যন্ত্র ব্যবহার করি সেগুলো হলো সরল যন্ত্র। এসব যন্ত্র আমাদেরকে কম শক্তি দিয়ে ভারী বস্তু তুলতে, ঠেলতে ও সরাতে সাহায্যে করে।

আমরা বিভিন্ন কাজে কী কী সরল যন্ত্র ব্যবহার করি?

কাজ: দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে সরল যন্ত্র শনাক্তকরণ।

যা করতে হবে:

১. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সরল যন্ত্রের ব্যবহার-সম্পর্কিত নিচের ছকটি পূরণ করি।

২. পূরণ করা ছকটি পাশের সহপাঠীর সাথে মিলিয়ে নিই ও আলোচনা করি।

দৈনন্দিন কাজ	ব্যবহৃত সরল যন্ত্র	কীভাবে সাহায্য করে
সবজি কাটা		
কাঠ কাটা		
বোতলের ঢাকনা খোলা		
দেহের দুই পাশে ভার বহন করা		
স্ক্রু লাগানো		
ঢালুপথ (র‍্যাম্প) দিয়ে উঠা		
কূপ থেকে পানি তোলা		

সারসংক্ষেপ

দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেক সরল যন্ত্র ব্যবহার করি, যেমন– ছুরি, কাঁচি, কুড়াল, পুলি, র‍্যাম্প, হাতুড়ি, স্ক্রু-ড্রাইভার ইত্যাদি। এসব যন্ত্র বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন– কাটা, তোলা, চাপ দেওয়া, ঘোরানো ইত্যাদি।

প্রাত্যহিক জীবনে সরল যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে আরও কিছু জানি

বিজ্ঞানের ভাষায় সরল যন্ত্র হলো এমন একটি যন্ত্র যা কাজ করার সময় বলের দিক ও বলের মাত্রার পরিবর্তন করে। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা বিভিন্ন ধরনের সরল যন্ত্র ব্যবহার করি, যা আমাদের দৈনন্দিন কাজকে সহজ, দ্রুত এবং কার্যকর করে তোলে। সরল যন্ত্রসমূহ যেমন–লিভার, পুলি, চাকা ও অক্ষ, হেলান সমতল, স্ক্রু এবং ওয়েজ–এগুলো সাধারণ গঠনের হলেও এগুলোর বৈজ্ঞানিক কার্যকারিতা অনেক। যেমন– টিউবওয়েলের হাতল, রিকশার চাকা, কুয়া থেকে পানি তোলার দড়ি ও চাকা, কাঠ কাটার কুড়াল, বোতলের ঢাকনা খোলার স্ক্রু–সবকিছুই সরল যন্ত্রের ব্যবহার। এগুলো আমাদের কম বল প্রয়োগে কাজ করতে সাহায্য করে এবং সময় ও পরিশ্রম বাঁচায়।

এসব যন্ত্র শুধু ঘরে নয়, বাইরের কাজেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। গুদামে ভারী মাল তুলতে ঢালু পথ ব্যবহার করা হয়, নির্মাণকাজে মালামাল তোলার জন্য পুলি ব্যবহার করা হয়, হাসপাতালে ঢালু র‍্যাম্প থাকে যাতে রোগীর স্ট্রেচার সহজে তোলা যায়। এছাড়াও দরজার হাতল, বোতলের ঢাকনা, কাঁটা চামচ, স্ক্রু ড্রাইভার ইত্যাদি প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত সরল যন্ত্র। এসব যন্ত্রের ব্যবহার আমাদের জীবনের নানা দিককে সহজতর করে তোলে ।

৫. কাজ সহজ করার ক্ষেত্রে সরল যন্ত্রের ভূমিকা

আমরা জেনেছি সরল যন্ত্র আমাদের দৈনন্দিন কাজকে সহজ, দ্রুত ও কার্যকর করে তোলে। এবার আমরা দেখি সরল যন্ত্রগুলো কীভাবে কাজ করে।

? কাজ সহজ করতে সরল যন্ত্র কীভাবে কাজ করে?

কাজ: সরল যন্ত্র দিয়ে কাজ করি (লিভার)

উপকরণ: একটি কাঠি বা স্কেল, ছোটো পাথর, পেনসিল (ভিত্তি)

যা করতে হবে:

১. একটি টেবিলের উপর একটি পেনসিল রাখি।

২. পেন্সিলকে ভিত্তি বানাই, তার উপর স্কেল রাখি।

৩. পেন্সিলের উপর স্কেলটি এমনভাবে রাখি যেন সি-স্যা এর মতো ওঠা-নামা করে।

৪. স্কেলের এক প্রান্তে একটি ছোটো পাথর রাখি।

৫. অন্য প্রান্তে আঙুল দিয়ে নিচের দিকে চাপ দিই।

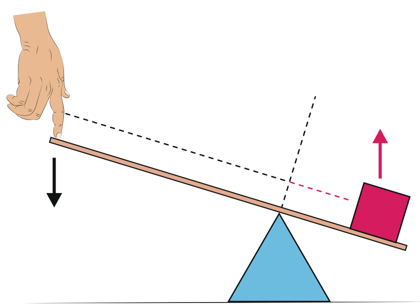

৬. স্কেলের নিচে পেনসিলের অবস্থান বদলিয়ে আঙুল দিয়ে চাপ দিই।

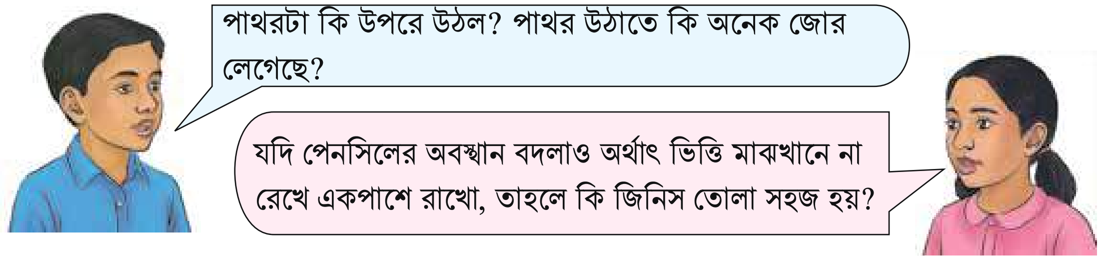

সহপাঠীদের সাথে আলোচনার করে দিপু ও জুঁইয়ের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করে নিচের ফাঁকা স্থানে লিখি।

সারসংক্ষেপ

লিভার পরীক্ষায় আমরা দেখেছি, একটি নির্দিষ্ট ভিত্তিবিন্দুর সাহায্যে কম জোর দিয়ে সহজেই ভারী বস্তু তোলা যায়। সরল যন্ত্র আমাদের দৈনন্দিন কাজকে সহজ করে এবং কম পরিশ্রমে বেশি কাজ করতে সাহায্য করে।

সরল যন্ত্র সম্পর্কে আরও কিছু জানি

আমাদের ব্যবহৃত অনেক সরল যন্ত্রের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি সরল যন্ত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন– হেলানো সমতল, কপিকল ও লিভার।

হেলানো সমতল

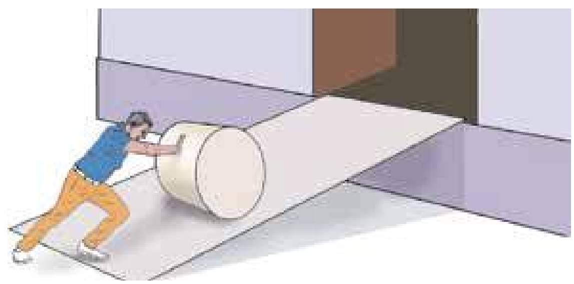

হেলানো সমতল হলো একটি ঢালু পথ বা তির্যক পৃষ্ঠ, যার সাহায্যে ভারী বস্তু সহজে উপরে তোলা বা নিচে নামানো যায়। হেলানো সমতলে বস্তু ঠেলে উঠানো সহজ হয়, কারণ এতে কম বল লাগে। কোনো বস্তুকে উপরের দিকে তুলতে হলে তাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। সরাসরি তোলার সময় আমরা বস্তুর ওজনের সমান বা বেশি বল প্রয়োগ করি। কিন্তু হেলানো সমতলে সেই একই কাজ ধীরে ধীরে ও কম বল প্রয়োগে করা যায়। হুইল চেয়ারের র‍্যাম্প, সিঁড়ি, ঢালু রাস্তা হলো হেলানো সমতলের উদাহরণ।

কপিকল

কপিকল হলো এমন একটি যন্ত্র যা একটি চাকায় দড়ি পেঁচিয়ে ভারী বস্তু সহজে উপরে তোলার কাজে ব্যবহার হয়। এই সরল যন্ত্রের সাহায্যে আমরা দড়ি নিচের দিকে টান দিয়ে ভারী জিনিস উপরের দিকের উঠিয়ে আনতে পারি। প্রতিদিন স্কুলে গিয়ে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ উপরে পতাকা তোলার জন্য দড়ি নিচের দিকে টানা হচ্ছে আর পতাকা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। পতাকা তোলার জন্য কপিকল ব্যবহার করা হয়। কপিকল ব্যবহার করে আমরা অল্প বল প্রয়োগ করে ভারী বস্তুকে সহজে উপরে উঠাতে পারি। আমরা এ ধরনের উদাহরণ আরও দেখতে পাই। যেমন– কূপ থেকে পানি তোলার দড়ি-চাকা, নির্মাণ কাজে নির্মাণ সামগ্রী তোলার যন্ত্র।

লিভার

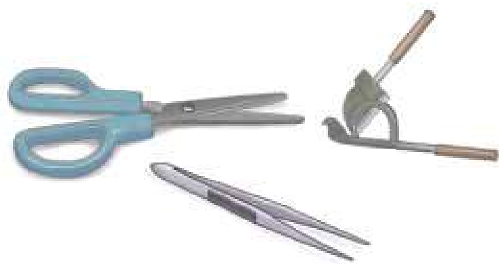

লিভার হলো এক ধরনের সরল যন্ত্র। লিভারের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জোর দিয়ে বস্তু সহজে তোলা বা সরানো যায়। এতে একপাশে চাপ দিলে অন্যপাশে ভার ওঠে বা নড়ে। লিভারের সাহায্যে বেশি ভার তোলার জন্য কম শক্তি লাগে। এরকম আরও অনেক সরল যন্ত্র আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। যেমন– সি-স্যা, সাঁড়াশি, ক্যান ওপেনার, পানি সেচের দোন ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দিই

ক) বল প্রয়োগের দুটি প্রধান পদ্ধতি কী?

- [ ] ঠেলা ও চাপ
- [ ] টান ও ধাক্কা
- [ ] ধাক্কা ও ঘর্ষণ
- [ ] চাপ ও স্পর্শ

খ) যখন একটি মার্বেলকে আগের চেয়ে বেশি জোরে ধাক্কা দেওয়া হয়, তখন সেটির গতি কেমন হয়?

- [ ] কমে যায়
- [ ] একই থাকে
- [ ] বেড়ে যায়
- [ ] থেমে যায়

গ) ঘাসের ওপর দিয়ে একটি বল গড়িয়ে দিলে তা তুলনামূলকভাবে কম দূরত্ব অতিক্রম করে কেন?

- [ ] ঘাস বলটিকে থামিয়ে দেয়
- [ ] ঘাসে বল লাফিয়ে উঠে
- [ ] ঘাসে ঘর্ষণ বল বেশি থাকে
- [ ] ঘাস বলকে টেনে রাখে

ঘ) নিচের কোন কাজটি করতে গেলে পৃথিবীর আকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়?

- [ ] সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামা
- [ ] ছাতা মেলে ধরা
- [ ] সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা
- [ ] বল মাটিতে ফেলা

ঙ) একটি কাঠি ও একটি পেনসিল দিয়ে পাথর তুলতে চাইলে আমরা নিচের কোন কৌশলটি ব্যবহার করব?

- [ ] কাঠি দিয়ে সরাসরি পাথর ঠেলা
- [ ] পাথরকে গড়িয়ে দূরে নেওয়া
- [ ] পেনসিল ও কাঠি দিয়ে পাথর ঠেলা
- [ ] পেনসিলকে ভিত্তিবিন্দু বানিয়ে কাঠিকে লিভার হিসেবে ব্যবহার করা

২। শূন্যস্থান পূরণ করি

ক. বল প্রয়োগ করে বস্তু .... যায়।

খ. বলের মাত্রা যত বেশি, বস্তুর ওপর প্রভাব তত ....।

গ. একটি বস্তুর পৃষ্ঠ যে দিকে সরে যেতে চায় তার .... দিকে ঘর্ষণ বল কাজ করে।

ঘ. পৃথিবী সকল বস্তুকে .... দিকে টানে।

ঙ. কাজ সহজ করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রকে .... যন্ত্র বলে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

৩। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নির্ণয় করি ও টিক দিই।

	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
মসৃণ পৃষ্ঠে ঘর্ষণ বল কম থাকে বলে বস্তু সহজে গড়িয়ে যেতে পারে।		
পৃথিবীর আকর্ষণ বল না থাকলে উপর থেকে ছেড়ে দেওয়া বস্তু উপরে উঠে যেত।		
ঘর্ষণ বলের কারণে হাঁটার সময় পিছলে যাই না।		
লিভার ব্যবহারে ভারী বস্তু তুলতে বেশি শক্তি লাগে।		
কপিকলের সাহায্যে রশি নিচে টেনে ভারী জিনিস সহজে উপরে তোলা যায়।		

৪. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক. ঘর্ষণ বল কাকে বলে?

খ. হেলানো সমতল কী?

গ. ঘর্ষণ বল না থাকলে আমাদের চলাফেরায় কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?

ঘ. বাড়িতে বা আশপাশে যেকোনো দুটি সরল যন্ত্র চিহ্নিত করে সেগুলোর ব্যবহার লেখো।

ঙ. যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল না থাকত, তাহলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন কেমন হতো? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

৫। বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক. ঘর্ষণ বল ও মাধ্যাকর্ষণ বল কী? এই দুই বল কীভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজ করে?

খ. মসৃণ এবং অমসৃণ পৃষ্ঠে বল গড়িয়ে দেওয়ার ফলে বলটি ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব অতিক্রম করে। এর কারণ ব্যাখ্যা করো।

গ. একটি ভারী পাথর উঠাতে বলা হলো, তাহলে আমরা কোন ধরনের সরল যন্ত্র ব্যবহার করব? কেন?

ঘ. মনে করো, বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান মেলায় ‘ঘর্ষণ বল’ ও ‘মাধ্যাকর্ষণ বল’ নিয়ে একটি প্রদর্শনী করতে হবে। দুটি বলের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য একটি পরিকল্পনা লেখো।

অধ্যায় ৮

ভূমিরূপ

আমাদের পৃথিবী কতই-না সুন্দর এবং বৈচিত্র্যময়! এর কোনো অঞ্চল উঁচু পাহাড়-পর্বত নিয়ে গঠিত। কোথাও রয়েছে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি, ছোটো-বড়ো অসংখ্য নদী ও সমুদ্র। আরও রয়েছে ম্যানগ্রোভ, চিরসবুজ বন, নদীর বয়ে নিয়ে আসা পলিমাটি দিয়ে গঠিত ব-দ্বীপ (যেমন– আমাদের বাংলাদেশ)। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের এরূপ নানা ধরনের গঠন প্রকৃতি, জলবায়ু অনুসারে গড়ে ওঠে জনবসতি এবং তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি।

১. ভূমিরূপ ও ভূমিরূপের বিভিন্ন ধরন

পাশের চিত্রটি লক্ষ করি। আমরা পৃথিবীর বাইরের বা ভূপৃষ্ঠের কঠিন, শুষ্ক যে আবরণ রয়েছে সেখানেই বসবাস করি, চাষাবাদ করি। একে আমরা ভূমি বলি। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমির আকৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন রকম। কোনো অঞ্চল সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থিত, যেমন– পাহাড়, পর্বত। কোথাও রয়েছে পানিশূন্য শুষ্ক ঊষর মরুভূমি। যেমন– আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি। আবার পৃথিবীর মেরু অঞ্চল সারাবছর বরফে ঢাকা থাকে। সমুদ্রতলেও বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ রয়েছে। পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমির এই যে বৈচিত্র্যময় গঠনগত আকৃতি বা রূপ, একেই বলা হয় ভূমিরূপ।

? ভূমিরূপের ধরনগুলো কী কী?

কাজ: ভূমিরূপের বিভিন্ন ধরন চিহ্নিতকরণ

যা করতে হবে:

নিচের ছকে নিজ জেলার নাম এবং এর ভূমির ৩টি বৈশিষ্ট্য লেখো।

জেলার নাম	ভূমির বৈশিষ্ট্য
	১. ২. ৩.

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমির রূপ ও গঠন ভিন্ন ভিন্ন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা বা অঞ্চলের ভূমির গঠনেও বৈচিত্র্য দেখা যায়।

ভূমিরূপের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে আরও কিছু জানি

পৃথিবী পৃষ্ঠের বা পৃথিবীর স্থলভাগের ভূমিরূপকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. পাহাড়-পর্বত, ২. মালভূমি, ৩. সমভূমি

১. পাহাড়-পর্বত

পাহাড়

পর্বত

পাহাড় এবং পর্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে অবস্থিত। পাহাড়গুলো পর্বতের তুলনায় কিছুটা কম উঁচু। বাংলাদেশের সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লায় পাহাড় রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহেও পাহাড় দেখা যায়। পর্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক বেশি উঁচুতে অবস্থিত, খাড়া ঢালবিশিষ্ট এবং বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পর্বতের উচ্চতা সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০ মিটার বা তার বেশি হয়। যেমন– আমাদের অতি পরিচিত হিমালয় পর্বতমালা।

২. মালভূমি

মালভূমি সাধারণত পর্বত থেকে নিচু কিন্তু সমভূমি থেকে উঁচু হয়। মালভূমি ঢালু হয়ে নিচের দিকে যায়। তবে এর ওপরের দিক প্রায় সমতল কিংবা কিছুটা ঢেউ খেলানো হয়। অনেকটা টেবিলের মতো দেখতে হয় বলে একে টেবিলল্যান্ডও বলা হয়। এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত তিব্বতের মালভূমি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মালভূমি। মালভূমির আশপাশে

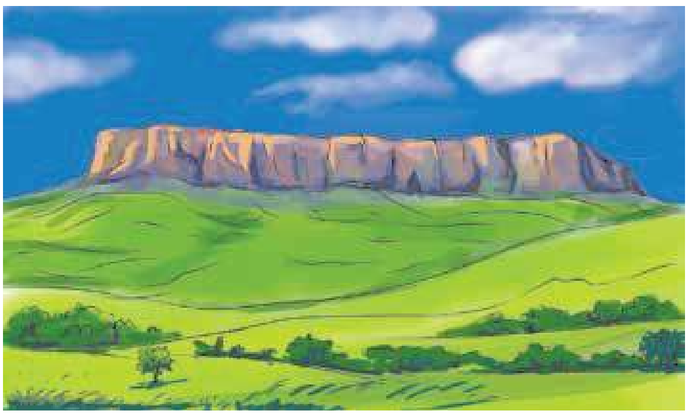

মালভূমি

বিস্তীর্ণ সমভূমি থাকে। সমভূমিতে পশুপালন এবং ফুল-ফল ইত্যাদি চাষ করে এখানকার অধিবাসীরা জীবনধারণ করেন।

৩. সমভূমি

সমভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সামান্য কিছু উপরে অবস্থিত। সমতলভূমি নিয়ে বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল গঠিত হয়। সমভূমি খাড়া বা ঢালু নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই সমতলভূমি নিয়ে গঠিত সমভূমি। কৃষিকাজের উপযোগী জমি, জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমতলভূমিতে অনেক সহজলভ্য। নদীর বয়ে আনা পলিমাটি দিয়ে গঠিত বলে এ অঞ্চলের মাটি উর্বর হয়। এজন্য বিভিন্ন প্রকার ফসল যেমন– ধান, গম, পাট, আলুসহ নানা শাকসবজি, ফলমূল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফসলের উৎপাদন বেশি হয়। কৃষিকাজ সমভূমি অঞ্চলের মানুষের প্রধান জীবিকা। তাছাড়াও মাছ শিকার, গরু-ছাগল ও অন্যান্য পশুপালন করেও সমভূমির অনেক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। এভাবে জীবন ধারণের অনুকূল পরিবেশ থাকায় পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ সমভূমিতে বাস করতে পছন্দ করে। এজন্য মানুষের জীবনে সমভূমির প্রভাব অপরিসীম।

পৃথিবীর স্থলভাগ বা ভূপৃষ্ঠের ভূমিরূপ

শুধু স্থলভাগ নয় মহাসাগরগুলোরও বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ রয়েছে। এগুলো হলো– মহীসোপান, মহীঢাল, গভীর সমুদ্রের সমভূমি এবং গভীর সমুদ্রখাত। মহাসাগরের তলদেশে পাহাড়, পর্বত, সমভূমি, এমনকি গভীর গিরিখাতও রয়েছে।

পৃথিবীর জলভাগ বা সমুদ্রতলের ভূমিরূপ

কাজ: বাংলাদেশের মানচিত্রে ভূমিরূপ চিহ্নিতকরণ

১। নিচে বাংলাদেশের মানচিত্র ও প্রতীকগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি।

২। এবার বাংলাদেশের কোন জেলায় কোন ধরনের ভূমিরূপ রয়েছে প্রতীকের সাহায্যে মানচিত্রে তার অবস্থান চিহ্নিত করি। এ কাজে প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নিই।

২. ভূমিরূপ পরিবর্তনের কারণ

আমরা ভূমিরূপের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে জেনেছি। নানাবিধ কারণে এই ভূমিরূপের পরিবর্তন হতে পারে। এই পরিবর্তন কখনো ধীর, কখনো আকস্মিক। এই পরিবর্তন কখনো প্রাকৃতিক আবার কখনো মানবসৃষ্ট কারণে ঘটে। এ কারণে কখনো কখনো ভূমিরূপের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

ভূমিরূপ পরিবর্তনের কারণগুলো কী কী?

কাজ: ভূমিরূপ পরিবর্তনের কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

যা করতে হবে:

১. নিজের দেখা বা শোনা বা বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ভূমিরূপ পরিবর্তনের বিষয়ে নিচের ছকটি পূরণ করি। [বোঝার সুবিধার জন্য একটি করে দেখানো হয়েছে]

ক্রমিক	দেখা বা শোনা বিভিন্ন ঘটনা	ভূমিরূপের সম্ভাব্য পরিবর্তন	পরিবর্তনের কারণ (প্রাকৃতিক অথবা মানবসৃষ্ট)
১	নদীভাঙন	ভূমি নদীতে হারিয়ে যায়	প্রাকৃতিক
২			
৩			

সারসংক্ষেপ

নদীভাঙন, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে ভূমিরূপ পরিবর্তন হয়। বাঁধ নির্মাণ, বন ধ্বংস, পাহাড় কাটা, শিল্পায়ন ও নগরায়ণ ইত্যাদি মানবসৃষ্ট কারণেও ভূমিরূপের পরিবর্তন হয়।

ভূমিরূপের পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে আরও কিছু জানি

প্রাকৃতিক কারণ

ভূমিরূপ পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সমুদ্রস্রোত, হিমবাহ, বায়ুপ্রবাহ, বন্যা ও ভূমিধস অন্যতম। প্রাকৃতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া সাধারণত অত্যন্ত দীর্ঘসময় ধরে ধীরগতিতে হয়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

নদীভাঙন

আমাদের দেশে বর্ষাকালে, বন্যা হলে নদীবাহিত পলিমাটি জমা হতে হতে নতুন ভূমি সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন চরাঞ্চল, দ্বীপ এভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে। আবার কখনো কখনো বন্যা বা অতিরিক্ত বৃষ্টির পানির কারণে পানির তীব্র স্রোতে ভূমিধস ও নদীভাঙন শুরু হয়। এটিও ভূমিরূপ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ।

ভূমিকম্প

ভূমিকম্পের কারণে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে থাকে। ভূমিকম্প দ্রুত ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তীব্র ভূমিকম্পের ফলে কোনো অঞ্চলের ভূমিরূপ খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে। ২০১৫ সালে নেপালে এমন ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে তীব্র গরম তরল লাভা নির্গত হয়। এই গলিত লাভা যে অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয় সেই অঞ্চলের ভূমি, নদী-নালা, বনভূমি, জনবসতিতে লাভা জমাট বেঁধে ভূমিরূপের দ্রুত এবং আমূল পরিবর্তন ঘটায়। ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে ২০২১ সালে আগ্নেয়গিরির এরূপ অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটে।

হিমবাহ

পৃথিবীর যেসব অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে সেসব অঞ্চলে বরফের প্রবাহ ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায়। এভাবে হিমবাহ সৃষ্টি হয়। যেমন– মেরু অঞ্চলে এমন হিমবাহ দেখা যায়। মেরু অঞ্চলের হিমবাহ দ্রুত গলছে। প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এর জন্য দায়ী।

সুনামি

সুনামি একটি ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সাধারণত সাগরের নিচে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি কারণে সাগরতলের ভূমির স্থানচ্যুতি বা ভাঙন ঘটে। অর্থাৎ ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে সাগরের পানি স্বাভাবিক ঢেউয়ের চেয়ে অনেকগুণ বেশি ফুলে-ফেঁপে উপকূলীয় এলাকায় উঠে আসে। এতে আকস্মিক ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে সেই অঞ্চলের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, জনবসতি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। পানিবাহিত বালু, মাটিসহ নানারকম উপাদান বিপুল পরিমাণে জমা হয়ে সেখানকার স্বাভাবিক পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। এ সময় ভূপৃষ্ঠের ভূমি রূপেরও পরিবর্তন হতে পারে।

মানবসৃষ্ট কারণ

নানাবিধ প্রাকৃতিক কারণে, যেমন ভূমির পরিবর্তন হয় তেমনি আমাদের অপরিকল্পিত বিভিন্ন কাজের কারণেও ভূমিরূপের পরিবর্তন হয়। কখনো কখনো এমন পরিবর্তন আমাদের জীবনযাপনের ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। মানবসৃষ্ট কারণে কখনো কখনো ভূমিরূপের দ্রুত বা আকস্মিক পরিবর্তন ঘটতে পারে।

বনভূমি ধ্বংস

রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বাড়িঘর নির্মাণের জন্য গাছপালা, বনভূমি কেটে উজাড় করা হচ্ছে। এর ফলে মাটিক্ষয় হচ্ছে। বৃষ্টিপাত কমে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাটি শুষ্ক এবং অনুর্বর হয়ে পড়ছে।

পাহাড় ধ্বংস

সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি বনাঞ্চল পুড়িয়ে জুম চাষ হচ্ছে, বাড়িঘর তৈরি করা হচ্ছে। ফলে ভূমিরূপ নষ্ট হচ্ছে, সামান্য বৃষ্টিপাতে ভূমিধস হচ্ছে। পাহাড় কাটার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। আমাদের দেশে প্রতি বছর পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস এবং পাহাড়ি ঢলে ক্ষয়ক্ষতির মূল কারণ পাহাড় ধ্বংস।

নদীতে বাঁধ নির্মাণ

নদীতে ব্রিজ, কালভার্ট, বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ বদলে যাচ্ছে। এতে কোথাও ভাঙনের সৃষ্টি হচ্ছে আবার কোথাও চর জেগে উঠছে। এর ফলে ভূমিরূপের আমূল পরিবর্তন ঘটছে। যেমন–ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের নদীগুলো নাব্যতা হারিয়েছে।

নগরায়ণ

ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর আবাস তৈরির জন্য নদী ও খাল ভরাট করে নতুন নগর তৈরি করা হচ্ছে, নগরকে প্রসারিত করা হচ্ছে। এর ফলে ভূমিরূপের আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। তাছাড়াও কলকারখানা ও নগরজীবনের বর্জ্য, মানহীন পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ভূগর্ভের প্রকৃতি নষ্ট করছে এবং ভূপৃষ্ঠেরও দূষণ ঘটাচ্ছে।

ইটের ভাঁটা

ইটভাঁটায় ইট পোড়ানোর কারণে মাটি তার স্বাভাবিক গঠন-বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে। মাটির গুণাগুণ নষ্ট হচ্ছে। জমি ফসল ফলানোর অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। তাছাড়া ইটভাঁটার ধোঁয়া বায়ু দূষণ ঘটায়।

শিল্প ও কলকারখানার বর্জ্য

শিল্প ও কলকারখানার বর্জ্য সরাসরি নদী, পুকুর ও খাল-বিলে ফেলা হচ্ছে। এর ফলে একাধারে পানি, মাটি দূষিত ও ব্যবহারের অযোগ্য হচ্ছে। মাটি এবং পানিতে থাকা নানা প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী ধ্বংস হচ্ছে। এর ফলে বিশেষ এলাকার ভূমিরূপ তার গঠন-বৈশিষ্ট্য হারায়। উদাহরণ হিসেবে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর কথা বলা যায়।

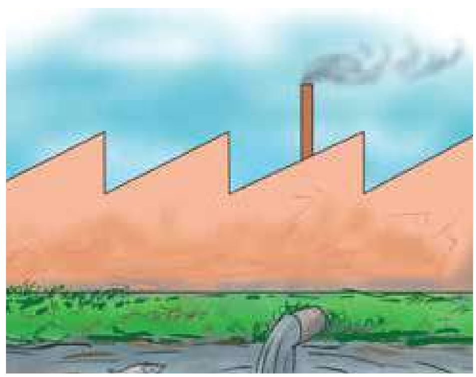

ভূগর্ভস্থ পানি অতিরিক্ত উত্তোলন

মাটির নিচ থেকে অতিরিক্ত পানি উত্তোলন ভূমিধসের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। সাধারণত খরা মৌসুমে বৃষ্টিপাতের অভাবে কৃষিকাজে জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা হয়। বিশ্বের যেসব স্থানে ভূগর্ভে পর্যাপ্ত পানির অভাব রয়েছে সেসব অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে জমি শুষ্ক ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান সময়ে ভূমিরূপ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হলো পরিবেশ দূষণ। বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং গ্রিন হাউস গ্যাস বাড়ছে। কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রচুর তাপ ধরে রাখতে পারে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোথাও তাপমাত্রার অতিরিক্ত বৃদ্ধিতে খরা ও অনাবৃষ্টি দেখা দিচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে আমাদের দেশের কথা বলা যায়। এখানে কয়েক বছর যাবৎ বৃষ্টিপাত অনেক কম হচ্ছে। ফলে গ্রীষ্মে প্রচণ্ড তাপদাহ সৃষ্টি হচ্ছে। নদী-নালা শুকিয়ে যাচ্ছে যা ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

৩. ভূমিরূপ পরিবর্তনে পানি ও বায়ুপ্রবাহের প্রভাব

ভূমিরূপ পরিবর্তনে পানি এবং বায়ুপ্রবাহের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে এগুলোও অন্যতম। সমুদ্রস্রোত, পানির তীব্র প্রবাহ, তীব্র বায়ুপ্রবাহ ও ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায়।

? পানি এবং বায়ুপ্রবাহ কীভাবে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায়?

কাজ: ভূমিরূপ পরিবর্তনে পানি ও বায়ুপ্রবাহের প্রভাব পর্যবেক্ষণ

যা করতে হবে:

১. বাস্তবে, ভিডিয়ো বা সিনেমায় দেখা ঘটনা যেমন–সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, মরুঝড়, পাহাড়ি ঢল– এমন দুটো ঘটনা নিয়ে চিন্তা করি।

২. পরিবেশে ঘটনা দুটোর প্রভাব কেমন ছিল? নিচের ছকে লেখো।

আমার দেখা ঘটনা	ঘটনার প্রভাব

সারসংক্ষেপ

পানি ও বায়ুপ্রবাহজনিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় ভূমিরূপের পরিবর্তন হয়। অতিবৃষ্টি, বন্যার তীব্র স্রোত, পাহাড়ি ঢল, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটে। মরু অঞ্চলে তীব্র বায়ুপ্রবাহের ফলে ধূলি এবং বালুঝড় হয়েও ভূমিরূপ পরিবর্তিত হয়।

ভূমিরূপের পরিবর্তনে পানি ও বায়ুপ্রবাহের প্রভাব সম্পর্কে আরও কিছু জানি

পানিপ্রবাহ

কখনো কখনো অতিবৃষ্টি, বন্যা এবং পাহাড়ি ঢলে পানির তীব্র প্রবাহের কারণে ভূমির ক্ষয় হয়। এর ফলেও ভূমিরূপ পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশে পাহাড়ি এলাকায় পাহাড় কেটে বাড়িঘর নির্মাণের ফলে পাহাড়ের মাটি দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে পাহাড়ি ঢলে প্রতিবছরই ভূমিধস ঘটনা ঘটে।

নদী ও সমুদ্রের স্রোত

নদী, সমুদ্রে পানির তীব্র স্রোত, পানি প্রবাহে ভূপৃষ্ঠের ত্বক ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং পরিবর্তিত হয়ে নতুন ভূমিরূপ সৃষ্টি করে। পানির তীব্র স্রোত বা প্রবাহে নদী বা সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলে ভূমিধস বা ভাঙন দেখা দেয়। বাংলাদেশে বর্ষাকালে পদ্মা ও যমুনা নদীর ভাঙনে প্রতিবছর অনেক এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ভূমিরূপের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

বায়ুপ্রবাহ

মরু অঞ্চলে প্রচণ্ড সূর্যতাপে বায়ু উষ্ণ বা গরম ও শুষ্ক থাকে। মরু অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। এসব অঞ্চলে তীব্র বায়ুপ্রবাহের ফলে ধূলি এবং বালুঝড় হয়। এতে বাতাসে ধূলিকণা, বালুকণা সরে গিয়ে দূরে অন্য জায়গায় জমা হয়ে দীর্ঘ, উঁচু উঁচু, বিস্তৃত ধুলাবালির স্তূপ তৈরি করে। এগুলোকে বালিয়াড়ি বলে।

৪. মানবসৃষ্ট কারণে ভূমিরূপ পরিবর্তন রোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়

ইতোমধ্যে জেনেছি, ভূমিরূপ পরিবর্তনের মানবসৃষ্ট প্রাথমিক কারণ হলো কৃষিকাজ ও খাদ্য উৎপাদনের জন্য বন উজাড় এবং নগরায়ন। ভূমিরূপ পরিবর্তনের ফলে সারা বিশ্বে পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র, জলবায়ু পরিবর্তিত হওয়ায় চরমভাবাপন্ন পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। এর ফলে বন্যা, খরা, প্রচণ্ড শীত, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, দাবানলের মতো দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। এজন্য আমাদের ভূমির পরিবর্তন রোধ করে এর সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ভূমি বা পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে এদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য পুনরায় ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া হলো ভূমি বা পরিবেশ সংরক্ষণ।

? কীভাবে মানবসৃষ্ট ভূমিরূপ পরিবর্তন রোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণ করা যায়?

কাজ: মানবসৃষ্ট ভূমিরূপ পরিবর্তন রোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণে উপায় চিহ্নিতকরণ

যা করতে হবে:

১. মানবসৃষ্ট কারণে ভূমিরূপের পরিবর্তন হচ্ছে এমন তিনটি ঘটনা উল্লেখ করি যা আমরা বাস্তবে অথবা ছবি কিংবা ভিডিয়োতে দেখেছি।

২. উল্লিখিত পরিবর্তন রোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় কী তা নিচের ছকে সংক্ষেপে লেখো।

ক্রমিক	ভূমিরূপ পরিবর্তনের ঘটনা	পরিবর্তন রোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়
ক		
খ		
গ		

সারসংক্ষেপ

বন ধ্বংস বন্ধ করা, বেশি করে গাছ লাগানো, তৃণভূমি ও জলাধার সৃষ্টি, পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পিত নগরায়ণ, নদী সংরক্ষণ ইত্যাদি আমাদের ভূমিরূপ পরিবর্তন রোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রকৃতিকে ভালোবেসে একটু সচেতন আর দায়িত্ববান হলে ভূমিরূপ পরিবর্তন রোধ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব।

মানবসৃষ্ট ভূমিরূপ পরিবর্তন রোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে আরও কিছু জানি

১. প্রতি বছর বন্যা, পাহাড়ি ঢল, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙনে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভূমিক্ষয় ভূমিরূপ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। বন ধ্বংস বন্ধ করে বেশি বেশি গাছ লাগালে মাটির গঠন শক্ত হয় ও ভূমিক্ষয় রোধ হয়। মাটিতে পানি ধরে রাখার জন্য তৃণভূমি সৃষ্টি করা যায়। কৃত্রিম পুকুর বা জলাধার তৈরি করে বৃষ্টির পানি ধরে রেখে শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচের মাধ্যমে জমি চাষ করা যায়। এতে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

ভূ-গর্ভের পানির ব্যবহার কম হয়।

২. অপরিকল্পিত উপায়ে বাঁধ, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ, নদী খনন, নদী থেকে অত্যধিক বালু উত্তোলন, জলাভূমি ভরাট বন্ধ করতে হবে। নদী ভরাট ও পাহাড় ধ্বংস করে নগরায়ণ বন্ধ করতে হবে। নদী বাঁচাতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করতে হবে। কৃষিজমি নষ্ট করে বা পাহাড় কেটে ঘরবাড়ি নির্মাণ, নগরায়ণ, কলকারখানা তৈরি বন্ধ করলে ভূমি সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

৩. সংবাদপত্র, টিভি, ম্যাগাজিন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভূমি সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিজ্ঞাপন, প্রবন্ধ প্রকাশ করে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভূমি সংরক্ষণের গুরুত্ব উল্লেখ করে ভূমিকাভিনয়, পোস্টার তৈরি করে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশের প্রতি মমত্ববোধ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। পাঠ্যপুস্তকে এ বিষয়ক বিষয় যুক্ত করলে সুফল পাওয়া যাবে।

আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য এই পৃথিবীকে নিরাপদ এবং বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য ভূমিরূপের পরিবর্তন রোধ ও ভূমি সংরক্ষণে সকলের যত্নশীল এবং সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এসো, প্রকৃতিকে ভালোবেসে এর অবদান ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরিবেশ সংরক্ষণে আমরা সবাই সচেষ্ট হই।

কাজ: সচেতনতামূলক পোস্টার তৈরি ও প্রদর্শন

১। নিচের ধারণাচিত্রটি বড়ো করে পোস্টারে এঁকে উপস্থাপন করি।

২। মানবসৃষ্ট ভূমিরূপ পরিবর্তন রোধে আমরা কী কী করতে পারি তা লিখে ধারণাচিত্রটি পূরণ করি।

৩। এবার ধারণাচিত্র সংবলিত পোস্টারটি শ্রেণিকক্ষ এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে টানিয়ে রাখি।

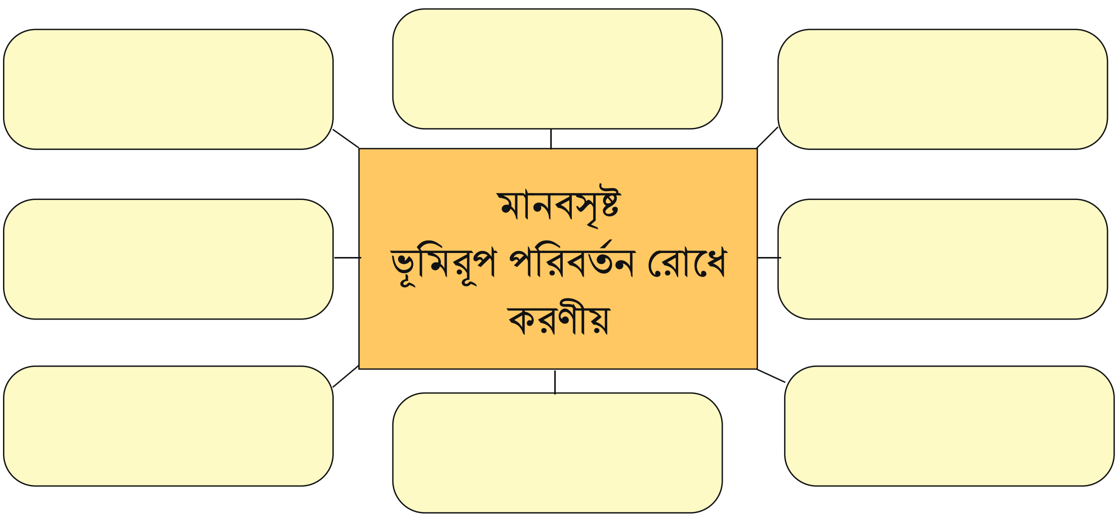

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দিই

ক) চাষাবাদের জন্য উপযোগী ভূমিরূপ কোনটি?

☐ পর্বত ☐ পাহাড় ☐ সমভূমি ☐ মালভূমি

খ) মালভূমি হলো–

☐ খাড়া ঢালবিশিষ্ট উঁচু ভূমি ☐ উপরিভাগ সমতল, সামান্য ঢেউ খেলানো

☐ নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে গঠিত ☐ সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে কিছু উপরে অবস্থিত

গ) ভূমিরূপ পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণ কোনটি?

☐ নদীতে বাঁধ নির্মাণ ☐ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

☐ বনাঞ্চল ধ্বংস করা ☐ ভাঁটায় ইট পোড়ানো

ঘ) অনিয়ন্ত্রিত নদী খননের ফলে কোনটি ঘটে?

☐ নদীতীরের ভূমিক্ষয় রোধ হয় ☐ নদীভাঙন বৃদ্ধি পেতে পারে

☐ নদীর নাব্য বৃদ্ধি পায় ☐ নদীর গতিপ্রবাহ ঠিক থাকে

২. শূন্যস্থান পূরণ করি

ক) পাহাড় ধ্বংসের মূল কারণ .... ।

খ) ভূমির পরিবর্তন রোধ ও সংরক্ষণে সকলের মধ্যে .... সৃষ্টি জরুরি।

গ) কলকারখানার বর্জ্য নদীতে ফেললে .... ঘটে।

ঘ) .... ভূমিরূপ পরিবর্তনের অন্যতম প্রাকৃতিক কারণ।

৩. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক) পাহাড়ের ঢালে চাষের ফলে পাহাড়ি ভূমিরূপের কী ধরনের পরিবর্তন হতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

খ) ভূমিরূপ পরিবর্তনের মানবসৃষ্ট দুটো কারণ লেখো।

৪. বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক) ভূমি সংরক্ষণ কাকে বলে? ভূমি ও পরিবেশ সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো।

খ) মনে করো, একটি স্থানে নদী ভরাট করে পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হলো। এমন কার্যক্রমে ঐ স্থানের ভূমিরূপ ও পরিবেশে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে? ব্যাখ্যা করো।

অধ্যায় ৯

পরিবেশ সংরক্ষণ

আমাদের চারপাশের থাকা মাটি, পানি, বায়ু, আলো, ঘর, বাড়ি, নদী, পাহাড়, গাছপালা, পশু, পাখি, কলকারখানা, গাড়ি ইত্যাদি উপাদান নিয়েই পরিবেশ। স্বাভাবিক পরিবেশে মানুষসহ অন্যান্য জীব ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে। মাটি, পানি, বায়ুতে জীবের জন্য ক্ষতিকর কোনো কিছু প্রবেশ করলে পরিবেশ দূষিত হয়। বিভিন্ন কারণে পরিবেশ দূষিত হয়। পরিবেশ দূষিত হলে মানুষসহ অন্যান্য জীবের বসবাসে সমস্যা হয়। তাই পরিবেশ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে আমরা কীভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি তা অনুসন্ধান করব।

১. পরিবেশ দূষণের উৎস ও কারণ

পরিবেশ দূষণের উৎস ও কারণ কী?

কাজ: বিদ্যালয় ও বাড়ির আশপাশ পর্যবেক্ষণ করে পরিবেশ দূষণের উৎস ও কারণ নির্ণয়

যা করতে হবে:

১. বিদ্যালয় ও বাড়ির আশপাশ খুঁজে দেখি, কী দিয়ে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং পরিবেশের কোন উপাদান দূষিত হচ্ছে– এসব তথ্য নিচের ছকে লেখো।

২. প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নিই।

দূষণের উৎস	কী দিয়ে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে	পরিবেশের কোন উপাদান দূষিত হচ্ছে
গাড়ি	গাড়ির কালো ধোঁয়া	বায়ু

সারসংক্ষেপ

মানুষের বিভিন্ন কাজের কারণে মাটি, পানি, বায়ু ও শব্দ দূষণ হয়। মানুষ যেখানে সেখানে মল ত্যাগ এবং যথেচ্ছভাবে বর্জ্য পদার্থ ফেলার মাধ্যমে পরিবেশের দূষণ ঘটে। এ ছাড়াও কৃষিকাজে অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক ব্যবহার পরিবেশকে দূষিত করে।

পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে আরও কিছু জানি

মাটি দূষণ

বায়ু দূষণ

পানি দূষণ

মানুষের কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয়। মাটি ও পানিতে ময়লা, আবর্জনা, মানুষের মল, বিভিন্ন প্রাণীর মল, শিল্পকারখানা ও হাসপাতালের বর্জ্য ফেলার কারণে মাটি ও পানি দূষিত হয়। যেখানে সেখানে পলিথিন ফেলে, কৃষিজমিতে অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে মানুষ মাটি ও পানির দূষণ ঘটায়। গাড়ি ও ইটভাটার কালো ধোঁয়া, শিল্পকারখানায় উৎপন্ন ধোঁয়া ইত্যাদি থেকে বায়ু দূষিত হয়। গাছপালা, পলিথিন পোড়ানো ধোঁয়া থেকে বায়ু দূষিত হয়। শিল্পকারখানায় উৎপন্ন তরল বর্জ্য পদার্থ থেকে পানি দূষিত হয়।

২. পরিবেশ দূষণের প্রভাব

? পরিবেশ দূষণের ফলে আমাদের কী ক্ষতি হচ্ছে?

কাজ: পরিবেশ দূষণের প্রভাব খুঁজে বের করা।

যা করতে হবে:

১. বাড়ি ও বিদ্যালয়ের আশপাশে মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ হচ্ছে কি না খুঁজে দেখি।

২. এসব দূষণের ফলে মানুষ ও অন্যান্য জীবের কী কী ক্ষতি হচ্ছে তা নিচের ছকে লেখো।

দূষণের ধরন	দূষণের কারণে যেসব ক্ষতি হচ্ছে
মাটি দূষণ	
পানি দূষণ	
বায়ু দূষণ	

সারসংক্ষেপ

মানুষের বিভিন্ন কাজের কারণে মাটি, পানি ও বায়ু দূষিত হয়। এই দূষণের কারণে মাটিতে ফসলের ক্ষতি হয়। পানি ব্যবহারের অযোগ্য হয় এবং মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতি হয়। বায়ু দূষণের কারণে আমাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

দূষণের প্রভাব সম্পর্কে আরও কিছু জানি

মাটি, পানি ও বায়ু দূষণের কারণে পরিবেশের ওপর বিভিন্ন প্রভাব পড়ে। বায়ু দূষণের কারণে বাতাসের মাধ্যমে দুর্গন্ধ ও রোগ-জীবাণু ছড়ায়। এতে আমাদের শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। পশুপাখিরও জীবন বাঁচাতে কষ্ট হয়। বায়ু দূষণের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে মেরুঅঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর নিচু ভূমি পানিতে ডুবে যাচ্ছে। মানুষের আবাসস্থল কমে যায়। দূষিত বায়ুতে শ্বাস নেওয়ার কারণে মানুষের ফুসফুসে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। যেমন- শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা, ফুসফুসের ক্যান্সার ইত্যাদি।

বায়ু দূষণের প্রভাব

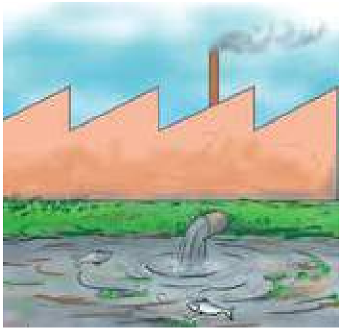

পানি দূষণের প্রভাব

পানি দূষণের কারণে আমাদের পানিও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। খাবার-উপযোগী নিরাপদ পানির পরিমাণ কমে যায়। পানিতে বসবাস করা মাছ ও অন্যান্য জীবের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এতে মাছের অভাবে মানুষের প্রাণিজ প্রোটিন পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। ফসল উৎপাদনের জন্য পানি ব্যবহার করতে অসুবিধা হয়। দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে ফসল উৎপাদন কমে যায়। দূষিত পানি দিয়ে উৎপাদিত ফসল খেয়ে মানুষ ও অন্যান্য জীবের বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। পানি দূষণের কারণে মানুষ পানিবাহিত রোগ কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয় ও বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগে আক্রান্ত হয়।

মাটি দূষণের ফলে মাটিতে গাছপালা জন্মাতে পারে না, চাষাবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেঁচো ও উপকারী জীবাণু মারা যায়। মাটি দূষণের কারণে জমির উর্বরতা কমে। জমিতে ফসল উৎপাদন হ্রাস পায়। কৃষকের আর্থিক ক্ষতি হয়। দূষিত মাটিতে উৎপাদিত ফসল খেয়ে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়, যেমন– বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ, টিটেনাস (ধনুষ্টঙ্কার)।

মাটি দূষণের প্রভাব

৩. পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ

মাটি দূষণ রোধের উপায়

জমিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সার (কম্পোস্ট, গোবর ইত্যাদি) ব্যবহার বৃদ্ধি করে, আবর্জনা ময়লা ফেলার নির্ধারিত স্থানে ফেলে মাটি দূষণ রোধ করা যায়। পুনর্ব্যবহারযোগ্য জিনিস যেমন– প্লাস্টিক বা পলিথিনের পরিবর্তে কাপড় বা পাটের ব্যাগ

ব্যবহার করা, কলকারখানা ও শিল্পবর্জ্য পরিশোধন করে যথাস্থানে ফেলা, ইত্যাদি কাজের মাধ্যমেও মাটি দূষণ রোধ করা যায়। গাছের শিকড় মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে ও মাটির ক্ষয়রোধ করে। তাই বেশি করে গাছ লাগিয়ে মাটির ক্ষয় রোধ করা যায়।

পানি দূষণ রোধের উপায়

শিল্পবর্জ্য ও কারখানার পানি পরিশোধন করে (ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট দিয়ে) নদী ও খালে ছেড়ে পানি দূষণ রোধ করা যায়। প্লাস্টিক ও আবর্জনা (বাজারের ব্যাগ, বোতল, প্যাকেট ইত্যাদি) নদীতে না ফেলে যথাস্থানে ফেলে পানি দূষণ কমাতে পারি। জমিতে বেশি সার দিলে তা বৃষ্টির পানির সাথে নদী বা পুকুরে গিয়ে পানি দূষিত করে। তাই সার ও কীটনাশক ব্যবহারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। পানি দূষণ রোধে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা দরকার। জনগণকে পানি রক্ষার গুরুত্ব বুঝাতে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করেও আমরা পানি দূষণ কমাতে পারি।

বায়ু দূষণ রোধের উপায়

বায়ু দূষণ রোধের জন্য পরিবেশবান্ধব যানবাহন (সিএনজি চালিত গাড়ি, ইলেকট্রিক গাড়ি বা বাইসাইকেল) বেশি ব্যবহার করা দরকার। গাড়ির ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিয়মিত গাড়ির ইঞ্জিন ও এক্সহস্ট সিস্টেম পরীক্ষা করে গাড়ি চালানো, কারখানায় ধোঁয়া বা ধূলিকণা ফিল্টার বসিয়ে পরিশোধন করা, পলিথিন ও প্লাস্টিক পোড়ানো বন্ধ করা, বনায়ন ও বেশি গাছ লাগানো ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে বায়ু দূষণ রোধ করতে পারি। তাই সচেতনতা, পরিবেশবান্ধব কাজের অভ্যাস এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বায়ু দূষণ রোধ করা যায়।

৪. পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশ সংরক্ষণ করার জন্য আমরা কী কী কাজ করতে পারি?

কাজ: পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় অনুসন্ধান

যা করতে হবে:

১. খাতায় নিচের ছকের মতো একটি ছক আঁকি।

২. নিজ নিজ এলাকায় কীভাবে মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ রোধ করে পরিবেশ সংরক্ষণ করা যায়, তা নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি এবং ছকে লেখো।

দূষণের ধরন	কীভাবে দূষণ রোধ করা যায়
মাটি দূষণ	
পানি দূষণ	
বায়ু দূষণ	

সারসংক্ষেপ

যেসব কারণে মাটি, পানি ও বায়ু দূষিত হয় সেসব কাজ পরিহার করতে হবে। বিশেষ করে পুকুর, খালবিল, নদীনালার পানিতে মলমূত্র ও তরল বর্জ্য ফেলে পানি দূষণ করা যাবে না। বর্জ্য পদার্থ যেখানে-সেখানে না ফেলে, নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে পরিবেশ দূষণ রোধ করা যায়।

পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে আরও কিছু জানি

পলিথিন, প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করে ও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ দূষণ রোধ করা যায়। এতে পরিবেশের সুরক্ষা হয়। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির অপচয় রোধ করে পরিবেশকে রক্ষা করা যায়। বাড়ির ময়লা-আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে অথবা নিরাপদ স্থানে ফেলে পরিবেশ দূষণ কমানো যায়। বাড়ির ময়লা আবর্জনা পুনর্ব্যবহার করেও পরিবেশকে রক্ষা করা যায়। খোলা পায়খানা ব্যবহার না করে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে পরিবেশ দূষণ কমানো যায়। শিল্পকারখানার কঠিন ও তরল বর্জ্যকে সরাসরি মাটি ও পানিতে ফেললে এবং গ্যাসীয় বর্জ্যকে সরাসরি বায়ুতে নির্গত করলে পরিবেশ দূষিত হয়। তাই শিল্পকারখানার কঠিন বর্জ্যপদার্থকে পরিশোধন করে মাটি, পানি ও বায়ুদূষণ কমাতে পারি। বাড়িতে, বিদ্যালয়ে এবং খালি জমিতে গাছ লাগিয়ে বা সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বায়ুদূষণ কমাতে পারি। পরিবেশের দূষণ কমানো এবং পরিবেশকে সংরক্ষণ করতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও এলাকার মানুষকে সচেতন করতে পারি।

বাসাবাড়ির বর্জ্যপদার্থ নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলা

গাছের পরিচর্যা

সামাজিক বনায়ন

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দিই

ক) কলকারখানার ধোঁয়া থেকে পরিবেশের কোন উপাদান দূষিত হয়?

☐ মাটি ☐ পানি

☐ বায়ু ☐ আলো

খ) জমিতে অতিরিক্ত সার ব্যবহার করা হলে নিচের কোনটি দূষিত হয়?

☐ গাছপালা ☐ পানি

☐ বায়ু ☐ মাটি

গ) নদীর পাশের শিল্পকারখানার তরল বর্জ্য পরিবেশের কোন উপাদান দূষিত করে?

☐ পানি ☐ বায়ু

☐ মাটি ☐ বাগান

২. বামপাশের শব্দের সাথে ডানপাশের শব্দের মিল করি।

পরিবেশের উপাদান	দূষণের কারণ
মাটি	রাসায়নিক সার
পানি	শিল্পবর্জ্য পোড়ানো
বায়ু	পলিথিন

৩. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক. বিদ্যালয় এলাকার মাটি দূষিত করে এরূপ কী কী পদার্থ খুঁজে পাওয়া যায় তা লেখো।

খ. পানি দূষণের কারণে কীভাবে মানুষ ও অন্যান্য জীবের ক্ষতি হয়?

৪. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

ক. পানি দূষণ কীভাবে রোধ করা যায় তা লেখো।

খ. পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্য বাসাবাড়ির বর্জ্য কীভাবে ফেলবে তা লেখো।

গ) প্লাস্টিক দূষণ কমাতে তুমি এবং তোমার পরিবার কী করতে পার, তার কয়েকটি উপায় লেখো।

অধ্যায় ১০

পৃথিবীর গতি

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা সৌরজগৎ এবং সৌরজগতের গ্রহ, উপগ্রহ সম্পর্কে জেনেছি। সেখানে আমরা পৃথিবী সম্পর্কেও কিছু না কিছু জেনেছি। এই অধ্যায়ে আমরা সৌরজগতে পৃথিবী কীভাবে গতিশীল এবং পৃথিবীর গতির কারণে কী ধরনের পরিবর্তন হয় তা অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব।

সৌরজগতে পৃথিবী সব সময় ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকে। পৃথিবী একদিকে তার নিজ অক্ষের চতুর্দিকে ঘোরে, আবার সূর্যের চতুর্দিকেও ঘোরে।

১. পৃথিবীর গতির ধরন

? পৃথিবীর কোন ধরনের গতির ফলে দিন ও রাতের পরিবর্তন হয়?

কাজ: সূর্য ও পৃথিবীর মডেল ব্যবহার করে পৃথিবীর গতির ধরন এবং দিবারাত্রি পর্যবেক্ষণ

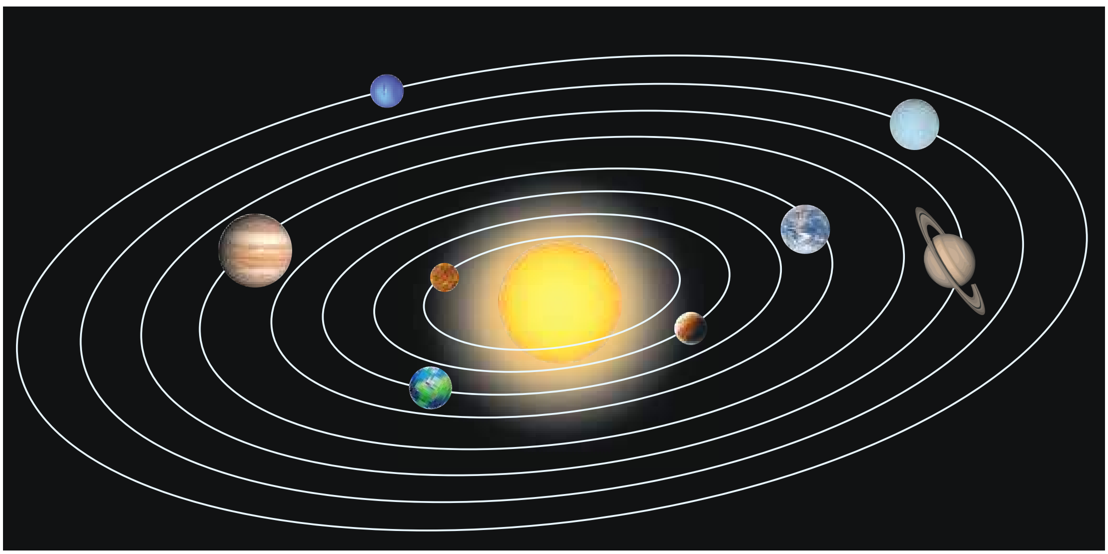

যা করতে হবে:

১. আমরা চতুর্থ শ্রেণিতে সৌরজগৎ সম্পর্কে জেনেছি। ইতঃপূর্বে আরও জেনেছি, সূর্য কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান থাকে। উপরের চিত্রটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি।

২. চিত্রে পৃথিবী ও সূর্যের অবস্থান নিয়ে ভাবি। পৃথিবীর কোনো স্থানে কেন কখনো সূর্যের আলো আসে এবং কখনো সূর্যের আলো আসে না এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করি। নিজের ভাবনা নিচের ছকে লিখে রাখি। ছকটি খাতায় এঁকেও লিখতে পারি।

পৃথিবীর কোনো স্থানে দিনের বেলা সূর্যের আলো আসার কারণ	পৃথিবীর কোনো স্থানে রাতের বেলা সূর্যের আলো না আসার কারণ

৩. পাশের সহপাঠীর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করি। নতুন কোনো তথ্য পেলে তা ছকে সংযোজন করি।

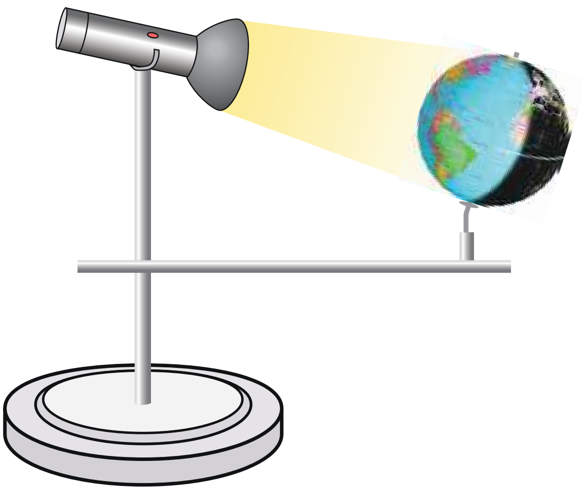

সূর্য ও পৃথিবীর মডেল

৪. পৃথিবীর কোনো স্থানে দিন ও রাতে সূর্যের আলো আসা ও না আসার কারণ ভালোভাবে বোঝার জন্য সূর্য ও পৃথিবীর মডেল তৈরি করে তা পর্যবেক্ষণ করি।

৫. সূর্য ও পৃথিবীর মডেল কী দিয়ে তৈরি করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করি। মডেল তৈরি করতে টর্চলাইট, ফুটবল, ধাতব তার ও কাঠি ব্যবহার করি। অন্য কোনোভাবেও কাজটি আমরা করতে পারি।

৬. পৃথিবীর মডেলের উপরে বাংলাদেশ ও আরও কয়েকটি দেশের নাম চিহ্নিত করি। এখানে উল্লেখ্য যে, নাম চিহ্নিত করার সময় পৃথিবীর চতুর্দিকে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের নাম চিহ্নিত করব। এক্ষেত্রে গ্লোব অথবা মানচিত্রের সহায়তা নিতে পারি।

৭. পৃথিবীর মডেলটিকে নিজ অক্ষের চতুর্দিকে ঘুরিয়ে পর্যবেক্ষণ করি, একটি নির্দিষ্ট স্থানে কোথায় সূর্যের আলো (টর্চ লাইট) পড়ে এবং কোথায় সূর্যের আলো পড়ে না তা পর্যবেক্ষণ করি।

৮. পৃথিবীর (ফুটবল) মডেলটিকে একবার সূর্যের (টর্চ লাইট) চতুর্দিকে ঘুরিয়ে আনি।

৯. বাংলাদেশে যখন সূর্যের আলো পড়ে, তখন আর কোন কোন দেশে সূর্যের আলো পড়ে এবং কোন কোন দেশে সূর্যের আলো পড়ে না, তা পর্যবেক্ষণ করে নিচের ছকে লেখো।

বাংলাদেশে যখন সূর্যের আলো পড়ে তখন আর কোন কোন দেশে সূর্যের আলো পড়ে	একই সময়ে কোন কোন দেশে সূর্যের আলো পড়ে না
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.

১০. পৃথিবীর কোনো স্থানে সূর্যের আলো কখনো পড়ে আবার কখনো পড়ে না কেন তা সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি। আলোচনার মাধ্যমে পৃথিবীতে দিন ও রাত কেন হয় তা বোঝার চেষ্টা করি।

সারসংক্ষেপ

সূর্য পৃথিবীকে আলো দেয়। পৃথিবী যখন নিজ অক্ষের উপর ঘুরতে থাকে তখন তাকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি বলে। এই আহ্নিক গতির কারণে পৃথিবীর একদিকে সূর্যের আলো পড়ে অন্যদিক অন্ধকার থাকে। যেদিকে সূর্যের আলো পড়ে সেদিকে দিন হয় এবং তার উল্টোদিকে রাত হয়। আবার পৃথিবী যখন সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরে আসে তখন তাকে পৃথিবীর বার্ষিক গতি বলে। এই বার্ষিক গতির কারণে ঋতু পরিবর্তন হয়।

পৃথিবীতে দিন ও রাত হওয়ার কারণ সম্পর্কে আরও কিছু জানি

সৌরজগতে সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান আটটি গ্রহ আছে। এদের মধ্যে পৃথিবী একটি গ্রহ। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একটি নির্দিষ্ট পথে ঘুরতে থাকে। সূর্যের চারদিকে ঘোরার সাথে সাথে পৃথিবী নিজ অক্ষের চারদিকে লাটিমের মতো ঘুরতে থাকে। নিজ অক্ষের চারদিকে পৃথিবীর এই ঘূর্ণনকে আহ্নিক গতি বলে। নিজ অক্ষের চারদিকে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসতে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড সময় প্রয়োজন হয়। এই সময়টাকে পৃথিবীর একদিন হিসেবে ধরা হয়। যদিও আমরা ২৪ ঘণ্টায় একদিন হিসাব করি।

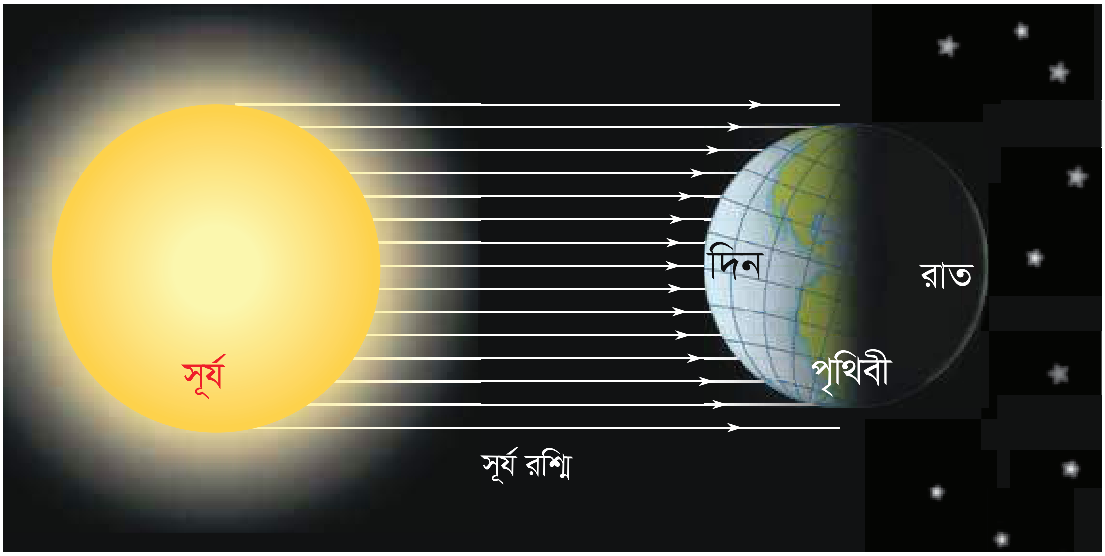

পৃথিবীর আকৃতি মোটামুটি গোলাকার। সূর্যকে একদিকে রেখে যখন পৃথিবী নিজ অক্ষের চারদিকে লাটিমের মতো ঘুরে তখন পৃথিবীর একদিকে সূর্যের আলো পড়ে। তখন পৃথিবীর সে অংশে দিন হয়। অন্য দিকে বিপরীত অংশে সূর্যের আলো পড়ে না, অন্ধকার থাকে। তখন পৃথিবীর সে অংশে রাত হয়।

পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে দিন ও রাত হয়। দিন ও রাত হওয়ার কারণে পৃথিবীর সকল অংশে কম বেশি সূর্যের আলো পড়ে। সূর্য থেকে আমরা তাপ ও আলো পাই। সূর্যের আলো ব্যবহার করে আমরা দিনের বেলায় প্রয়োজনীয় কাজ করে নিতে পারি। সূর্যের আলো থাকার কারণে গাছপালা জন্মে। মাঠে ফসল ফলে। আমরা তা খেয়ে জীবন বাঁচাতে পারি। সারা দিন কাজ করে রাতের বেলা বিশ্রাম নিই। আবার সকাল থেকে কাজ করতে পারি।

২. ঋতু পরিবর্তন

ঋতু পরিবর্তনের কারণ কী?

কাজ: সূর্য ও পৃথিবীর মডেল ব্যবহার করে ঋতু পরিবর্তন শনাক্তকরণ

যা লাগবে: সূর্য ও পৃথিবীর মডেল

যা করতে হবে:

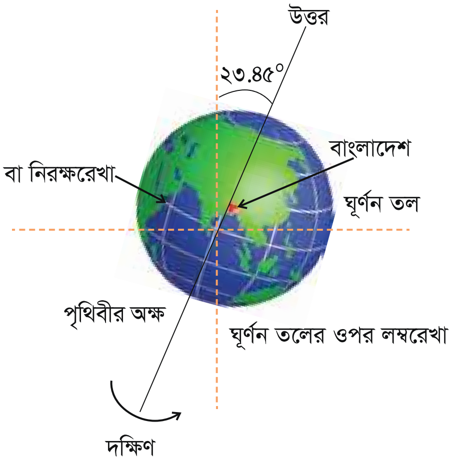

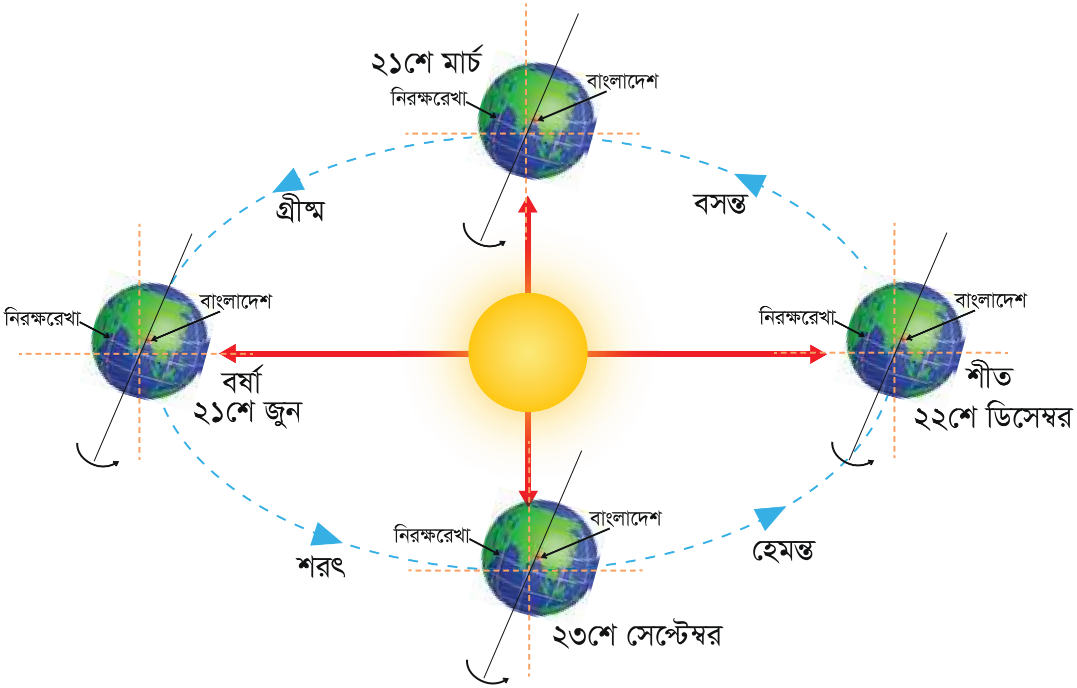

১. উপরের চিত্র পর্যবেক্ষণ করি। বছরের কোন সময়ে, কীভাবে আমাদের অঞ্চলগুলোতে (বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার) সূর্যের আলো পড়ে তা দেখি।

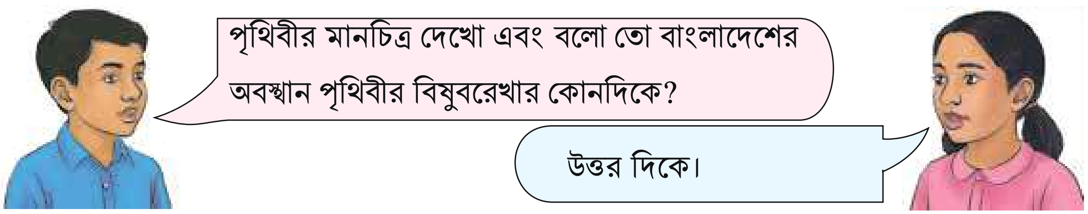

২. সূর্য ও পৃথিবীর মডেল ব্যবহার করে, পৃথিবীকে সূর্যের চারদিকে ঘুরিয়ে পর্যবেক্ষণ করি এবং নিচের ছক পূরণ করার চেষ্টা করি। ছক পূরণ করার সময়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি। নমুনা হিসেবে একটি পূরণ করে দেওয়া আছে।

সময়	বাংলাদেশ অঞ্চলে যেভাবে সূর্যের আলো দেয়	বাংলাদেশ অঞ্চলের তাপমাত্রা কেমন থাকে?	বাংলাদেশ অঞ্চলে যে ঋতু হয়
জুন মাস	খাড়াভাবে	বেশি থাকে	গ্রীষ্মকাল
ডিসেম্বর মাস			
মার্চ মাস			
সেপ্টেম্বর মাস			

৩. প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি। বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের ভিন্নতার কারণে আমাদের বাংলাদেশ অঞ্চলে কী কী ভিন্নতা হতে পারে তা আলোচনার মাধ্যমে বের করার চেষ্টা করি।

ঋতু পরিবর্তন সম্পর্কে আরও কিছু জানি

পৃথিবীর উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু এবং পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্যে কাল্পনিক সংযোজক সরলরেখাকে পৃথিবীর অক্ষরেখা বলে। এই অক্ষরেখাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী নিজ অক্ষে লাটিমের ন্যায় ঘোরে। আমরা পৃথিবীর আহ্নিক গতি সম্পর্কে ইতোমধ্যে জেনেছি। আহ্নিক গতি ছাড়াও পৃথিবীর আরও এক ধরনের গতি আছে। সূর্যের চারদিকে একটি কক্ষপথে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় পৃথিবী একবার ঘুরে আসে। এই গতিকে পৃথিবীর বার্ষিক গতি বলে। এজন্য ৩৬৫ দিনে এক বছর ধরা হয়। অতিরিক্ত ৬ ঘণ্টার জন্য প্রতি চার বছর পর বছরে ১ দিন বেশি হয়। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরার সময় অক্ষরেখাটি একটু হেলানো অবস্থায় থাকে। এতে কখনো পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে থাকে। আবার কখনো দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে থাকে। আমাদের বাংলাদেশ অঞ্চল পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। সূর্য থেকে আমাদের অঞ্চলে আলো কখনো তির্যকভাবে কখনো খাড়াভাবে আসে। এর ফলে বছরের কোনো সময়ে আমাদের অঞ্চলের তাপমাত্রা কম থাকে আবার কোনো সময়ে আমাদের অঞ্চলের তাপমাত্রা বেশি থাকে।

সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণন, পৃথিবীর হেলে থাকা অক্ষ, দিনের দৈর্ঘ্যের তারতম্য ইত্যাদি কারণে আমাদের অঞ্চলে বছরে ছয়টি ঋতু দেখা যায় । এগুলো হলো– গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। এর মধ্যে ৩টি ঋতু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিচে দেওয়া হলো।

গ্রীষ্মকাল

বাংলা বছরের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এবং ইংরেজি বছরের এপ্রিল-মে-জুন মাসের দিকে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে থাকে। এই সময়ে এই অঞ্চলে দিনের দৈর্ঘ্য বড়ো হয় এবং সূর্য খাড়াভাবে পৃথিবীকে কিরণ দেয়। এতে বাংলাদেশসহ আশপাশের অঞ্চলে তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে এবং তীব্র গরম অনুভূত হয়। এই সময়কে আমরা গ্রীষ্মকাল বলি। এই সময়ে বাতাস শুষ্ক থাকে এবং আমাদের অঞ্চলের খাল-বিল শুকিয়ে যায়।

বর্ষাকাল

ষড়ঋতুর এই বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালের পরেই আসে বর্ষাকাল। বাংলা বছরের আষাঢ়-শ্রাবণ এবং ইংরেজি বছরের জুন-জুলাই-আগস্ট মাসের দিকে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে থাকে। এই

সময়ে বাতাস দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থাকায় বাতাসের সাথে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প থাকে। ফলে এই সময়ে এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এতে বাংলাদেশসহ আশপাশের অঞ্চলে তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কমতে থাকে। এই সময়কে আমরা বর্ষাকাল বলি। বর্ষাকালে আমাদের অঞ্চলের খাল-বিল পানিতে ভরপুর থাকে।

শীতকাল

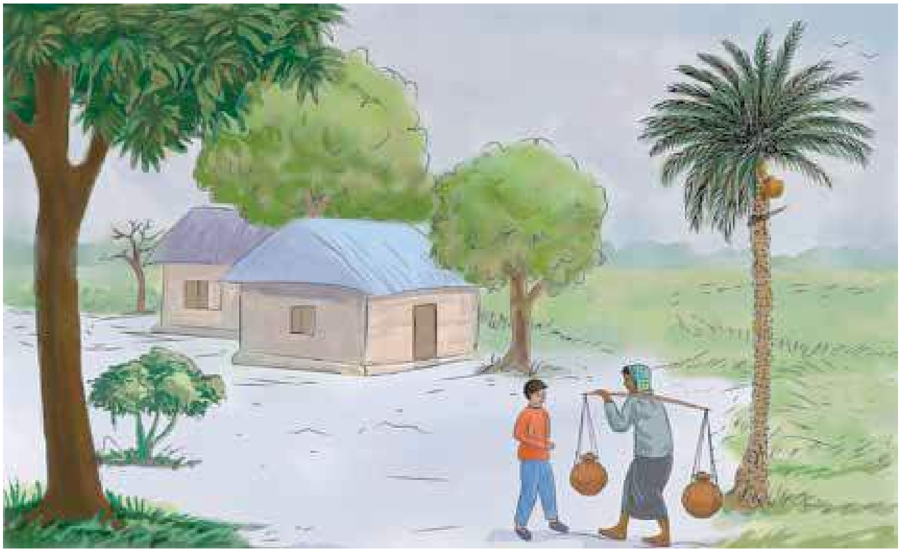

বাংলা বছরের পৌষ-মাঘ এবং ইংরেজি বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসের দিকে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্য থেকে হেলে থাকে। এই সময়ে এই অঞ্চলে দিনের দৈর্ঘ্য ছোটো হয় এবং সূর্য তির্যকভাবে পৃথিবীকে কিরণ দেয়। এতে বাংলাদেশসহ আশপাশের অঞ্চলে তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম থাকে এবং ঠান্ডা অনুভূত হয়। এই সময়কে আমরা শীতকাল বলি। এই সময়ে বাতাস শুষ্ক থাকে এবং উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে বাতাস প্রবাহিত হয়।

৩. দৈনন্দিন জীবনে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব

দৈনন্দিন জীবনে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব কীভাবে মোকাবিলা করব?

কাজ: বিভিন্ন ঋতুতে মানুষের জীবন-যাপন পর্যবেক্ষণ

যা করতে হবে:

১. বিভিন্ন ঋতুতে মানুষের জীবন-যাপনের ছবি পর্যবেক্ষণ করি।

২. পাশের সহপাঠীর সাথে আলোচনা করি। সুস্থ ও নিরাপদ জীবন যাপনের জন্য কোন ঋতুতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তা আলোচনা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

ক) কোন ঋতুতে কোন ধরনের পোশাক পরি?

খ) কোন ঋতুতে কোন ধরনের খাবার খাই?

গ) ঋতুভেদে প্রতিদিন কী কী কাজ করি?

ঘ) স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন ঋতুতে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করি?

৩. আমরা আলোচনা করে যা পেয়েছি তা নিচের ছকে লিখে রাখি। নিজের খাতায় ছক এঁকেও লিখতে পারি।

ঋতুর নাম	পোশাক	খাবার	প্রতিদিনের কাজ	স্বাস্থ্য সুরক্ষা
গ্রীষ্মকাল				
বর্ষাকাল				
শীতকাল				

সারসংক্ষেপ

আমাদের দেশে বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে। গ্রীষ্মকালে প্রচুর গরম থাকে, শীতকালে অনেক ঠান্ডা থাকে আবার বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত হয়। তাই প্রকৃতির এই ভিন্ন ভিন্ন আচরণের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য আমাদের জীবন-যাপনের কৌশলে পরিবর্তন করতে হয়।

ঋতু পরিবর্তনের কারণে নিরাপদ জীবন যাপন সম্পর্কে আরও কিছু জানি

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। প্রতিটি ঋতুর বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। সুস্থ জীবন যাপনে প্রতিটি ঋতুতে প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য আমাদের ভিন্ন ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়।

গ্রীষ্মকালে প্রকৃতির তাপমাত্রা বেশি এবং প্রচুর গরম অনুভূত হওয়ায় আমাদের সতর্ক থাকতে হয়। এই সময়ে পাতলা সুতি কাপড় পরা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। শীতকালে প্রকৃতির তাপমাত্রা কম এবং প্রচুর ঠান্ডা অনুভূত হয়। এই সময়ে মোটা কাপড় বা উলের তৈরি কাপড় পরতে হয়।

গ্রীষ্মকালে স্বাভাবিক খাবারের সাথে প্রচুর পানি পান করতে হয়, রসালো ফল খেতে হয়। গরমের মধ্যে বাইরে থেকে ঘরে এসে হঠাৎ ঠান্ডা পানি পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না। শীতকালে ঠান্ডার মধ্যে হালকা গরম পানি পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

গ্রীষ্মকালে প্রখর তাপে বাইরে কম বের হতে হয়। এই সময়ে ছাতা ব্যবহার করতে হবে। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় নদ-নদী, খাল-বিল পানিতে ভরা থাকে। আমাদের সাঁতার শেখা প্রয়োজন। একা একা পানিতে গোসল করা ঠিক নয়। বর্ষাকালে বাইরে বের হওয়ার সময়ে ছাতা অথবা রেইনকোট সাথে রাখতে হবে। এই সময়ে চলাচলের রাস্তা পিচ্ছিল থাকে। তাই হাঁটার সময়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ঋতু পরিবর্তনের সময় তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের সাথে শিশুদের যত্নের পরিবর্তন করতে হয়। গ্রীষ্মকালে শিশুদের নিয়মিত গোসল করা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা জরুরি। এ সময় সুস্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন থাকতে হয়। শীতকালে ত্বকের পরিচর্যা করতে হয়। শীতকালে শিশুদের ঠান্ডাজনিত রোগ বেশি হয়। তাই এ সময়ে ছোটো শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নশীল থাকতে হয়। বর্ষাকালে সংক্রমণ রোগ প্রতিরোধ করার জন্য নিয়মিত হাত ধোয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালে মশার প্রকোপ বাড়ে, তাই এ সময় মশার কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দিই

ক) সৌরজগতের কেন্দ্রে থাকে কোনটি?

☐ পৃথিবী ☐ সূর্য ☐ চাঁদ ☐ তারা

খ) বাংলাদেশে যখন মধ্যরাত তখন কোন দেশে দিন?

☐ ভারত ☐ পাকিস্তান ☐ যুক্তরাজ্য ☐ যুক্তরাষ্ট্র

গ) পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে কোনটি ঘটে?

☐ দিন-রাত ☐ ঋতু পরিবর্তন ☐ পূর্ণিমা ☐ অমাবস্যা

২. নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় করি।

	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
ক. জানুয়ারি মাসে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্য থেকে দূরে থাকে।		
খ. অক্টোবর মাসের শেষে হেমন্তকাল হয়।		
গ. গ্রীষ্মকালের পরেই আসে শরৎকাল।		
ঘ. পৃথিবীর গতি ৩ ধরনের।		

৩. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক. বাংলাদেশে ঋতু কয়টি? তাদের নাম কী কী?

খ. বাংলাদেশের বর্ষাকাল সম্পর্কে ২টি বাক্য লেখো।

৪. বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক. দিন ও রাত সংঘটিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।

খ. পৃথিবীর কোন গতির কারণে ঋতু পরিবর্তন হয়? কারণ ব্যাখ্যা করো।

গ. ঋতু পরিবর্তনে নিরাপদ জীবনযাপন কীভাবে প্রভাবিত হয়?

অধ্যায় ১১

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু হলো কোনো অঞ্চলের অনেক বছরের গড় আবহাওয়া। আবহাওয়া প্রতিদিন বদলায়, কিন্তু জলবায়ু ধীরে ধীরে অনেক বছরে বদলায়। আমাদের পৃথিবীর জলবায়ু এখন আর আগের মতো নেই, বদলাতে শুরু করেছে। একে জলবায়ু পরিবর্তন বলে। এই পরিবর্তনের কারণে অনেক সময় খুব গরম পড়ে, বেশি বৃষ্টি হয়, আবার কখনো শুষ্কতা দেখা দেয়। জলবায়ুর কিছু উপাদান আছে। যেমন– সূর্যের আলো, তাপমাত্রা, বৃষ্টি, বাতাস ইত্যাদি। এসব উপাদান পরিবর্তন হলেই জলবায়ু পরিবর্তন হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের পেছনে মানুষ ও প্রকৃতির কিছু নিয়ামক বা কারণ আছে। এই অধ্যায়ে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ, প্রভাব এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অভিযোজন সম্পর্কে জানব।

১. জলবায়ুর উপাদান

আমরা চতুর্থ শ্রেণিতে আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জেনেছি। আবহাওয়ার উপাদানগুলো জলবায়ুরও উপাদান। কোনো স্থানের আবহাওয়া সেই স্থানের জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল।

? জলবায়ুর উপাদান কী কী?

কাজ: প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে জলবায়ুর উপাদানসমূহ চিহ্নিতকরণ।

যা করতে হবে:

১. প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে আজকের আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি । আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ করতে নিচের ছকে উল্লিখিত তথ্যগুলো লিখি।

আবহাওয়ার তথ্য	কী দেখতে পেলাম?
আকাশের অবস্থা কেমন? (মেঘাচ্ছন্ন, রৌদ্রোজ্জ্বল, বর্ষণমুখর)	
বাতাস কোন দিকে বইছে? (বায়ু প্রবাহের দিক)	
জোরে বাতাস বইছে কি না ? (বায়ু প্রবাহের তীব্রতা)	
ঘাম হচ্ছে নাকি শুষ্ক অনুভূত হচ্ছে? (বায়ুর আর্দ্রতা)	

সারসংক্ষেপ

কোনো স্থানের বায়ুর তাপমাত্রা, বায়ুর আর্দ্রতা, আকাশের অবস্থা, বায়ু প্রবাহের দিক, বায়ু প্রবাহের তীব্রতা, বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ইত্যাদি দিয়েই আবহাওয়ার খবর দেওয়া হয়। এগুলো মূলত আবহাওয়ার

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

উপাদান। কোনো স্থানের দীর্ঘ সময়ের, সাধারণত ২৫-৩০ বছরের আবহাওয়ার গড় বা সামগ্রিক অবস্থার হিসাবকে জলবায়ু বলে। তাই আবহাওয়ার উপাদানই হলো জলবায়ুর উপাদান।

জলবায়ুর উপাদান সম্পর্কে আরও কিছু জানি

বায়ুর তাপমাত্রা, বায়ুর আর্দ্রতা, বায়ু প্রবাহের দিক, বায়ু প্রবাহের তীব্রতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মূলত জলবায়ুর উপাদান। কোনো একটি স্থানের জলবায়ু বর্ণনা করার সময় এই উপাদানগুলোর বহু বছরের গড় মান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে ছয়টি ঋতুর ভিন্নতা উপলব্ধি করা খুবই কষ্টকর। একটি অঞ্চলের জলবায়ুর ধারণা থেকে আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যৎ তথ্য দেওয়া হয়।

তাপমাত্রা

সময় ও ঋতুর পরিবর্তনের কারণে কোনো স্থানে কখনো গরম এবং কখনো ঠান্ডা অনুভূত হয়। একটি স্থানের বায়ু কতটা গরম অথবা কতটা ঠান্ডা তা তাপমাত্রা পরিমাপ করে জানা যায়। থার্মোমিটারের সাহায্যে কোনো স্থানের তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায়।

বায়ু প্রবাহের দিক

বাংলাদেশসহ আশপাশের দেশে গ্রীষ্মকালে বায়ু দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। আবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। শীতকালে বাংলাদেশ অঞ্চলে বায়ু উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। একটি স্থানের আবহাওয়া বর্ণনা করার সময় বায়ু কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হয় তা জানানো হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা ও বায়ুচাপের তারতম্যের কারণে

বায়ু প্রবাহিত হয়।

বায়ু প্রবাহের তীব্রতা

বাংলাদেশসহ সকল অঞ্চলেই বায়ু প্রবাহের যেমন একটা দিক আছে, একইভাবে বায়ু প্রবাহের একটা গতিবেগও রয়েছে। বায়ু যেদিক থেকেই প্রবাহিত হোক না কেন কখনো এর গতিবেগ বেশি বা তীব্র হয়, আবার কখনো কম বা মৃদু হয়।

বাতাসের আর্দ্রতা

বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। সাগরের উপর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময় সাগর থেকে জলীয়বাষ্প স্থলভাগের দিকে নিয়ে আসে। এই বায়ুকে আর্দ্র বায়ু বলে। কোনো স্থানের আবহাওয়া বর্ণনা করার সময় সে স্থানের বায়ুতে শতকরা কত ভাগ জলীয়বাষ্প থাকে তা প্রকাশ করা হয়।

বৃষ্টিপাত

বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে বায়ু দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প নিয়ে আসে। একইসাথে নদী, খাল, বিল, পুকুর থেকেও পানি বাষ্পীভূত হয়ে জলীয়বাষ্পে পরিণত হয়। এই জলীয়বাষ্প উপরে উঠে শীতল ও ভারী হয়ে মেঘে পরিণত হয়। মেঘ-পরবর্তী সময়ে পানির কণায় পরিণত হয়ে বৃষ্টিপাত হিসেবে নিচে নেমে আসে। বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ যত বেশি হয় বৃষ্টিপাতের পরিমাণও তত বেশি হয়।

২. আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য

আবহাওয়া হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানের আকাশ ও বায়ুমণ্ডলের সাময়িক অবস্থা। জলবায়ু হলো কোনো স্থানের বহু বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা। তাই আবহাওয়া ও জলবায়ু এক নয়।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কী কী?

কাজ: তথ্য বিশ্লেষণ করে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য নিরূপণ।

যা করতে হবে:

১. আজকের তাপমাত্রা, বাতাসের গতি, আকাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি। প্রয়োজনে ওয়েদার অ্যাপস

ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষকের সহায়তা নিই। তথ্যগুলো খাতায় লিখি।

২. বাংলাদেশের গত ১০ বছরের গড় তাপমাত্রা, বার্ষিক বৃষ্টিপাত, আপেক্ষিক আর্দ্রতার নিচের তালিকাটি পর্যবেক্ষণ করি। আমরা চাইলে আবহাওয়ার অন্যান্য উপাদানের তথ্যগুলোর বিগত ১০ বছরের গড় অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।

বছর	গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেলসিয়াস)	গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)
২০১৫	২৫.৭০	২২০০	৭৮
২০১৬	২৫.৭২	২২৫০	৭৯
২০১৭	২৫.৭৩	২৩০০	৮০
২০১৮	২৫.৭৫	২১৫০	৭৭
২০১৯	২৫.৭৭	২১০০	৭৬
২০২০	২৫.৭৮	২৩০০	৭৮
২০২১	২৫.৭০	২৪০০	৮০
২০২২	২৫.৭৪	২৫০০	৮১
২০২৩	২৫.৭৬	২৬০০	৮২
২০২৪	২৫.৭৭	২৭০০	৮৩

তথ্যসূত্র : বিশ্বব্যাংক, মহাকাশ গবেষণা সংস্থা

৩. সরবরাহকৃত তথ্যের আলোকে আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য নিচের ছকে লিপিবদ্ধ করি।

আবহাওয়া	জলবায়ু

আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আরও কিছু জানি

আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আবার পার্থক্যও আছে। আবহাওয়া হলো কোনো স্থানের প্রকৃতির অল্প সময়ের অবস্থা। আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তনশীল। অপরদিকে জলবায়ু হলো কোনো স্থানের ২৫-৩০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা। জলবায়ু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি পরিমাপের মাধ্যমে আবহাওয়া সম্পর্কে জানা যায়। অপরদিকে জলবায়ু দীর্ঘমেয়াদি তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে গড় হিসাব করা হয়।

৩. জলবায়ুর পরিবর্তন

প্রতিদিন আবহাওয়া একই রকম থাকে না। আবহাওয়ার ভিন্নতা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। আবহাওয়ার উপাদানগুলোর উল্লেখযোগ্য স্থায়ী পরিবর্তন হলো জলবায়ু পরিবর্তন। কোনো স্থানের জলবায়ু হঠাৎ পরিবর্তন হয় না, তা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়।

? জলবায়ুর পরিবর্তন কীভাবে হয়?

কাজ: পৃথিবী এবং বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা বিশ্লেষণ করে জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা করা।

যা করতে হবে:

১) নিচের ছকটি লক্ষ করি। এখানে প্রতি দশ বছরকে এক দশক ধরে বিগত পাঁচ দশক বা পঞ্চাশ বছরের পৃথিবীর বার্ষিক গড় তাপমাত্রা এবং বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা দেওয়া হয়েছে।

২) ছক পর্যবেক্ষণ করে পৃথিবী এবং বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রার কী পরিবর্তন হয়েছে? হ্রাস নাকি বৃদ্ধি পেয়েছে তা ছকের ডানপাশের কলামে লেখো।

সাল (দশক)	পৃথিবীর বার্ষিক গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেলসিয়াস)	বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেলসিয়াস)	লক্ষণীয় পরিবর্তন (হ্রাস বা বৃদ্ধি)
১৯৭০-১৯৭৯	১৪.০	২৫.৫৫	
১৯৮০-১৯৮৯	১৪.১	২৫.৭৪	
১৯৯০-১৯৯৯	১৪.৩	২৫.৮৭	
২০০০-২০০৯	১৪.৫	২৬.১৩	
২০১০-২০১৯	১৪.৮	২৬.৩২	

৩) তথ্যগুলো নিয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করি। প্রয়োজনে শিক্ষককে প্রশ্ন করে বুঝে নিই।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই ঘটছে। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা স্থায়ীভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। এভাবে জলবায়ু পরিবর্তন হতে থাকলে এক সময় পৃথিবী বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে।

জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে আরও কিছু জানি

বাংলাদেশে পূর্বে ছয় ঋতুর আলাদা রূপ ছিল। গ্রীষ্মে খরতাপ, বর্ষায় নিয়মিত বৃষ্টি, শরতে কাশফুল, হেমন্তে নতুন ধানের ঘ্রাণ, শীতে কুয়াশা আর বসন্তে ছিল ফুলের সৌন্দর্য। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গ্রীষ্ম ও বর্ষার শুরু এবং স্থায়িত্ব অনিয়মিত। অতীতে গরমকাল সহনীয় ছিল, আর শীতকাল দীর্ঘ হতো। জলবায়ু বিপর্যয়ে বর্তমানে গরমে টিকে থাকা মুশকিল। শীত কম সময় স্থায়ী হয়। এক সময়ে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে নিয়মিত ও মাঝারি বৃষ্টিপাত হতো। কৃষক জানতো কখন ফসল লাগাতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সময়মতো বৃষ্টি হয় না। কখনো অনেক আগে বৃষ্টি হয়, কখনো অনেক পরে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এখন ডেঙ্গু জ্বর, সর্দি, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগ হয়। কয়েক দশক আগেও এত ঘনঘন রোগ হতো না। আগের দিনে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙন মাঝেমধ্যে হতো। বর্তমানে জলবায়ুর বৈশ্বিক পরিবর্তনে প্রায় প্রতি বছর এসব দুর্যোগ হয়। এরূপ কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের আবহাওয়ার উপাদানগুলোর স্থায়ী পরিবর্তন ঘটলে তখন তাকে জলবায়ুর পরিবর্তন বলা হয়। জলবায়ুর পরিবর্তন আবহাওয়ার পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল।

৪. জলবায়ুর পরিবর্তনের নিয়ামকসমূহ

পৃথিবীর সব অঞ্চলের জলবায়ু একই রকম নয়। এর কোনো অঞ্চল উষ্ণ এবং কোনো অঞ্চল শীতল। আবার কোনো স্থানে অনেক বৃষ্টি হয় এবং কোনো স্থানে বৃষ্টি হয় না। কিছু ভৌগোলিক বিষয়ের পার্থক্যের কারণে স্থানভেদে জলবায়ুর এরকম পার্থক্য দেখা যায়। এই বিষয়গুলোকে জলবায়ুর নিয়ামক বলে।

? জলবায়ু পরিবর্তনের নিয়ামকসমূহ কী কী?

কাজ: মানচিত্র পর্যবেক্ষণ

যা করতে হবে:

১. বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক জলবায়ুর মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করি।

ক. কেন পাহাড়ি এলাকায় শীত বেশি অনুভূত হয়?

খ. কোন অঞ্চলে গরম বেশি অনুভূত হয়?

গ. বনভূমিতে কেন বৃষ্টিপাত বেশি হয়?

২. প্রশ্নগুলো সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে খাতায় লেখো।

সারসংক্ষেপ

তাপমাত্রা, বায়ু প্রবাহ, ভূমির উচ্চতা ইত্যাদির ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক সম্পর্কে আরও কিছু জানি

অক্ষাংশ: পৃথিবী গোলাকার এবং তার ঘূর্ণনের অক্ষ কিছুটা হেলে আছে (প্রায় ২৩.৫ ডিগ্রি)। পৃথিবীর অক্ষাংশের তারতম্যের কারণে বিভিন্ন জায়গায় সূর্যের আলো ভিন্নভাবে পড়ে। নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলগুলোতে সূর্যের আলো খাড়াভাবে পড়ে, তাই এসব জায়গা গরম হয়। আর যেসব জায়গা মেরুর কাছাকাছি, সেখানে সূর্যের আলো তির্যকভাবে পড়ে, তাই সেসব জায়গা ঠান্ডা থাকে। অর্থাৎ নিরক্ষরেখা থেকে কোনো স্থানের দূরত্ব যত বেশি, সেই স্থানের তাপমাত্রা তত কম হয়।

উচ্চতা: যত উঁচুতে উঠা যায়, তাপমাত্রা তত কমে। সাধারণভাবে প্রতি ১০০০ মিটার উপরে উঠলে তাপমাত্রা প্রায় ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যায়। এজন্য একই অক্ষাংশে হলেও পাহাড়ি এলাকা ঠান্ডা হয়। যেমন– বাংলাদেশের দিনাজপুর আর ভারতের শিলং একই অক্ষাংশ রেখায় অবস্থিত। দিনাজপুরের অবস্থান সমতলে, কিন্তু শিলংয়ের অবস্থান পাহাড়ে হওয়ায় সেখানে ঠান্ডা বেশি। তাই উচ্চতার পার্থক্যের কারণে তাপমাত্রার তারতম্য হয়।

সমুদ্র থেকে কোনো স্থানের দূরত্ব: সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানের আবহাওয়া সাধারণত মৃদু থাকে, খুব বেশি গরম বা ঠান্ডা হয় না। কারণ সমুদ্রের পানি ধীরে গরম বা ঠান্ডা হয়, যা আশপাশের স্থানের আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে। যেমন–কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী সমুদ্রের পাশে হওয়ায় এসব স্থানের জলবায়ু রাজশাহীর তুলনায় অনেক সহনশীল। সেজন্য সমুদ্র থেকে কোনো স্থানের দূরত্ব ঐ স্থানের জলবায়ুকে প্রভাবিত করে।

বায়ু প্রবাহের দিক: কোনো জায়গার আবহাওয়া কেমন হবে, তা অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। যেমন–বাতাস যদি কোনো এলাকায় বেশি জলীয়বাষ্প নিয়ে আসে, তাহলে সেখানে অনেক বৃষ্টি হয়। আমাদের দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, বর্ষাকালে বায়ু সাগর থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু শীতকালে উত্তর দিক থেকে শুষ্ক ও শীতল বায়ু দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাই তখন বৃষ্টি হয় না এবং শীত অনুভূত হয়।

সমুদ্র স্রোত: সমুদ্রের পানির স্রোত যদি উষ্ণ বা ঠান্ডা হয়, তাহলে তার প্রভাব উপকূল এলাকার বাতাসেও পড়ে। যেমন–বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টেকনাফ, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল প্রভৃতি উপকূলীয় জেলা) বঙ্গোপসাগরের উষ্ণ স্রোতের কারণে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বেড়ে যায়।

পর্বতের অবস্থান: যেখানে পাহাড় বা পর্বত আছে, সেখানে বাতাসের চলাচল বাধা পায়। ফলে সেই এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশি হতে পারে। যেমন–হিমালয়ের আশপাশে অনেক বৃষ্টি হয়। এই কারণে পাহাড়ের অবস্থান কোনো স্থানের জলবায়ুকে প্রভাবিত করে।

ভূমির ঢাল: কোনো এলাকার ভূমির ঢালের ওপরও সেই এলাকার জলবায়ু কেমন হবে তা নির্ভর করে। ভূমির ঢাল যদি এমন হয় যেখানে সূর্যের আলো সরাসরি পড়ে, সেখানে তাপমাত্রা বেশি হবে। ভূমির ঢাল জলবায়ুর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

মাটির প্রকৃতি: বালিমাটি (বেলেমাটি) দ্রুত গরম বা ঠান্ডা হয়। কিন্তু পলিমাটি ধীরে গরম বা ঠান্ডা হয়। বিভিন্ন প্রকৃতির মাটির তাপধারণ ক্ষমতা ভিন্ন হয়। তাই মাটির প্রকৃতিও জলবায়ুতে প্রভাব ফেলে।

বনভূমি: যেখানে বন বেশি থাকে, সেখানে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে, বৃষ্টি বেশি হয় এবং ঝড়ঝঞ্ঝার প্রকোপ কম হয়। তাই বনভূমিও জলবায়ুর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

৫. জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণ

বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণ এবং মানুষের সৃষ্ট কর্মকাণ্ডের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়াই হলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন।

? জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ কী কী?

কাজ: পরীক্ষণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ গ্রিন হাউস প্রভাব শনাক্তকরণ।

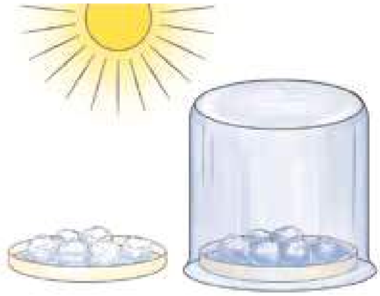

যা প্রয়োজন : পরীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হলো– সমান আকারের কয়েক টুকরা বরফ, দুটি হাফ প্লেট বা চা-কাপের প্লেট, একটি কাচের গ্লাস এবং সূর্যের তাপ।

যা করতে হবে:

১. সমান আকারের কয়েক টুকরা বরফ দুটি প্লেটে রাখি। একটি প্লেটের বরফ কাচের গ্লাস দিয়ে ঢেকে দিই। তারপর প্লেট দুটি সূর্যের তাপে রাখি। কোন প্লেটের বরফ দ্রুত গলে যায় তা দেখি এবং দ্রুত গলার কারণ নিচের ফাঁকা স্থানে লিখি।

সারসংক্ষেপ

আমরা নিশ্চয়ই দেখেছি যে প্লেটের বরফ কাচের গ্লাস দিয়ে ঢাকা ছিল, সেই প্লেটের বরফ আগে গলে গেছে। এর কারণ হলো সূর্যের তাপ সহজেই কাচের গ্লাসের ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু কাচের গ্লাসের ভিতর থেকে তাপ বের হতে পারে না। কাচের দেয়ালে বাধা পায়। এতে গ্লাসের ভিতরের তাপ বাইরের তুলনায় বেশি থাকে। ফলে বেশি তাপে বরফ দ্রুত গলে যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে আরও কিছু জানি

জলবায়ু পরিবর্তন কিছু প্রাকৃতিক কারণে হয়ে থাকে, যেমন– আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, পৃথিবীর গতি পরিবর্তন, পানির স্রোত ও ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি। আবার কিছু মনুষ্যসৃষ্ট কারণেও জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন– খনিজ জ্বালানি ব্যবহার, পাহাড় কাটা, বনভূমি উজাড়, কার্বন নিঃসরণ ইত্যাদি।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি। মানুষের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। শীতপ্রধান দেশে কাচের ঘর তৈরি করে কৃষিকাজ করা হয়। কাচের ঘরে তাপ আটকে রেখে সবুজ উদ্ভিদ জন্মানো হয় বলে এই ঘরকে গ্রিনহাউস বলে। গ্রিনহাউসের মধ্যে বাইরের তুলনায় তাপমাত্রা বেশি থাকে।

গ্রিনহাউস

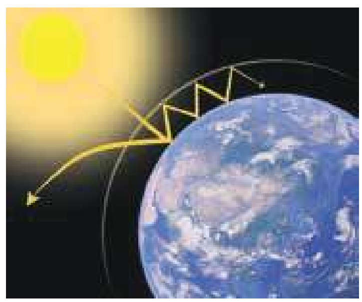

গ্রিনহাউস প্রভাব

সূর্যের আলো ও তাপ যখন পৃথিবীতে আসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল তখন গ্রিন হাউসের মতো কাজ করে। বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ থাকে। এর মধ্যে কিছু গ্যাসীয় পদার্থ হলো গ্রিনহাউস গ্যাস, যেমন–

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

জলীয়বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ইত্যাদি। বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসীয় পদার্থসমূহ গ্রিনহাউসের দেয়ালের মতো কাজ করে। সূর্যের তাপ পৃথিবী পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস থাকার কারণে এই তাপ বের হতে দেয় না, পৃথিবীতে তাপ গ্রিনহাউসের মতো পৃথিবীতে আটকে রাখে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। একেই আমরা গ্রিনহাউস প্রভাব বলি।

আমরা আমাদের প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বন থেকে প্রচুর পরিমাণ গাছপালা বা উদ্ভিদ কেটে ফেলি। এই উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলের ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে। ফলে পরিবেশ শীতল থাকে। পরিবেশে গাছপালার পরিমাণ কমে গেলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায়। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

৬. পরিবেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কী কী প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়?

কাজ: নিজের পরিবেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের তালিকা তৈরিকরণ।

যা করতে হবে:

১. আমাদের দেশে যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয় তার একটি তালিকা করি এবং নিচের ধারণাচিত্রে লিখি। যেমন– ঘূর্ণিঝড় একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

২. তালিকাটি পাশের সহপাঠীর তালিকার সাথে মিলিয়ে নিই। সহপাঠীর সাথে আলোচনায় নতুন কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে জানলে তা লেখো।

পরিবেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে আরও কিছু জানি

বাংলাদেশের জলবায়ু অনুসারে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটে থাকে। যেমন– বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। গরম বেশি হয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঝড় আসে যা কালবৈশাখী নামে পরিচিত। এই সময়ে বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হয়। আবার আষাঢ়-শ্রাবণ মাস বর্ষাকাল, এ সময়ে ভারী বৃষ্টিপাত হয়। পৌষ মাসে শীত শুরু হয়। বাংলাদেশের মতো পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সে অঞ্চলের জলবায়ু অনুসারে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটে। তবে জলবায়ু ভিন্ন হওয়ার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনার সময়ও ভিন্ন হয়।

আমরা দেখছি, বিগত কয়েক বছরে পৃথিবীতে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, তাপপ্রবাহ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, দাবানল, টর্নেডোসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকৃতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।দ

জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং এর প্রভাব

বাংলাদেশ একটি সমুদ্র-উপকূলীয় দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এখানে যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটছে, আমাদের দেশের ওপর তার প্রভাব সরাসরি পড়ছে। এর ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপন ব্যাহত হচ্ছে। মানুষ কাজ হারাচ্ছে এবং কৃষিকাজের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।

তীব্র তাপদাহ ও খরা

আমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছি প্রতি বছর আমাদের দেশে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতিমাত্রায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া হলো তীব্র তাপদাহ। তীব্র তাপদাহের কারণে ফসল উৎপাদন হ্রাস পায়। এমনকি উৎপন্ন ফসলও নষ্ট হয়ে যায়। এ সময়ে বৃষ্টিপাত কম হয়। অতি তাপে মাটি শুকিয়ে শক্ত হয় ও মাটি ফেটে যায়। একে আমরা খরা বলি।

শৈত্যপ্রবাহ

পৌষ-মাঘ মাসে আমাদের দেশের উত্তর দিক থেকে শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়। শীতল বাতাসের কারণে কখনো কখনো বায়ুর তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। তখন তীব্র শীত অনুভূত হয়। তীব্র শীতে আমাদের প্রতিদিনের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। তবে তীব্র শীত আমাদের দেশে খুব কম সময় স্থায়ী হয়।

কালবৈশাখী ঝড়

গ্রীষ্মকালে তীব্র তাপে সমুদ্রের জলভাগের তুলনায় স্থলভাগ অনেক বেশি গরম হয়। গরমে স্থলভাগের বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। সমুদ্রের জলভাগের বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। জলভাগ ও স্থলভাগের তাপমাত্রার পার্থক্য বেশি হওয়ায় বায়ুপ্রবাহের গতি তীব্র হয় এবং বজ্রসহ ঝড় হয়। এই বজ্রসহ ঝড় আমাদের দেশে কালবৈশাখী নামে পরিচিত। কালবৈশাখী ঝড় মোটামুটি ২০ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই ঝড়ের সময়ে শিলাবৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

টর্নেডো

টর্নেডো হলো শক্তিশালী ঘূর্ণায়মান বায়ু প্রবাহ। খুবই স্বল্প এলাকার মধ্যে ঘূর্ণায়মান এই বায়ু প্রবাহ ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে মেঘ পর্যন্ত হয়ে থাকে। কখনো কখনো টর্নেডো একটি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। টর্নেডোর কারণে গ্রামটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

ঘূর্ণিঝড়

অতি গরমে সমুদ্রের জলভাগের উপরের বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। এতে সমুদ্রে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। নিম্নচাপের ফলে সমুদ্রের উপরে ঘূর্ণায়মান বায়ু প্রবাহ সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের উপরের এই বায়ু প্রবাহ ঘূর্ণিঝড় নামে পরিচিত। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের কারণে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় হয়। সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড়ের এলাকা প্রায় ৫০০ থেকে ৮০০ কিলোমিটার হয়ে থাকে।

সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি

অতি গরমে হিমালয় পর্বতে থাকা বরফ গলে পানি নদীর মাধ্যমে সমুদ্রে চলে আসে। পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের জলরাশি ঠান্ডায় জমে বরফ হিসেবে থাকে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বরফ গলে সমুদ্রের পানি বাড়ছে। এর ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে লবণাক্ত পানি উপকূলীয় জেলাসমূহে (খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরগুনা) প্রবেশ করে। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়ায় বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী নিম্নাঞ্চল পানিতে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ফলে মানুষ বাসস্থান হারিয়ে ফেলবে।

বন্যা

বাংলাদেশের নদনদীতে পানির প্রবাহ কমে গিয়েছে। এতে পলিমাটি জমা হয়ে নদীর পানি ধারণক্ষমতা কমে গিয়েছে। আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বাংলাদেশসহ এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। একইসাথে তাপমাত্রা বেশি হওয়ায় হিমালয় পর্বতের বরফ গলে গিয়ে নদী দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়। নদীর ধারণক্ষমতা কমে যাওয়ায় হিমালয়ের বরফ গলা পানি ও অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নিচু ভূমিতে প্রবেশ করে। ফলে নিচু ভূমিতে অবস্থিত ঘর, বাড়ি, স্কুল, বাজার ইত্যাদি পানিতে তলিয়ে যায়। একে বন্যা বলে।

মানুষের জীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটছে তেমনি মানুষের জীবনের ওপর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলছে।

মানুষের জীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কী কী?

কাজ: মানুষের জীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব চিহ্নিতকরণ।

যা করতে হবে:

১. নিচের ছবিগুলো দেখে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা করি এবং খাতায় লেখো।

২. সহপাঠীর সাথে আলোচনা করি এবং নতুন তথ্য পেলে তাও খাতায় লেখো।

সারসংক্ষেপ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের চারিপাশের পরিবেশে বিরূপ প্রভাব পড়ে। কৃষি উৎপাদন বিঘ্নিত হওয়াসহ বিভিন্নভাবে মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। আমরা নানারকম রোগে ভুগি।

মানুষের জীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে আরও কিছু জানি

জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের জীবনে প্রধানত নিম্নবর্ণিত প্রভাবসমূহ পড়ে–

- অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করে (যেমন– হিটস্ট্রোক, শ্বাসকষ্ট)।
- দূষণের কারণে এলার্জি, হাঁপানি, ত্বকের রোগ বেড়ে যাচ্ছে।
- মশাবাহিত রোগ, যেমন– ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া বাড়ছে।
- খরা বা অতিবৃষ্টির কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। কৃষিজমি নষ্ট হলে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক মানুষ মারা যায় এবং ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মেরামত বা দুর্যোগ প্রতিরোধে খরচ বাড়ে, ফলে সাধারণ মানুষের ব্যয়ও বেড়ে যায়। বন্যার পানিতে ঘরবাড়ি ডুবে যায় এবং মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়লে উপকূলীয় মানুষ তাদের ঘরবাড়ি হারায়। মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য স্থানান্তরিত হয়–এদের 'জলবায়ু শরণার্থী' বলা হয়।

- ঘনঘন দুর্যোগ, ক্ষতি ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মানুষের মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে।
- কৃষি, মৎস্য, পর্যটন এবং শ্রমনির্ভর খাতে কাজের সুযোগ কমে যায়। জীবনযাত্রার মান নিচে নেমে আসে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অভিযোজন কৌশল

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী মানুষ ঘূর্ণিঝড়, বন্যাসহ অনেক প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য অভিযোজন কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

? জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কী কী অভিযোজন কৌশল নেওয়া যায়?

কাজ: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অভিযোজন কৌশল নির্বাচন।

যা করতে হবে:

১. নিচের চিত্রগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি।

২. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চিত্রে প্রদর্শিত অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে চিন্তা করি এবং সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে অভিযোজন কৌশলগুলো খাতায় লেখো।

৩. চিত্রে প্রদর্শিত অভিযোজন কৌশল ছাড়া আরও কৌশল চিন্তা করে লেখো।

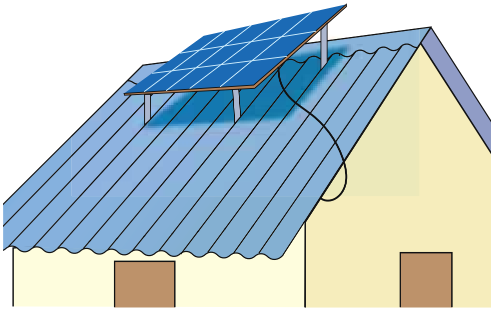

সারসংক্ষেপ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলার জন্য মানুষ বিভিন্ন অভিযোজন কৌশল অবলম্বন করে থাকে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে আরও কিছু জানি

পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। এই ক্ষতি মোকাবিলা করার জন্য দুটো পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। যেমন–

ক. জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমানো
খ. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো

ক. জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমানো: বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কমানোর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন কমানো যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমানোর জন্য দেশের সরকার, জনগণ ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলোর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন–

- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা।
- সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বন সৃষ্টি করা।
- বাড়ি ও বিদ্যালয়ের আশপাশে গাছপালা লাগানো।
- জীবাশ্ম জ্বালানির (পেট্রোল, ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস) ব্যবহার কমানো।
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সৌরবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ) ব্যবহার বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

খ. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব দেশ ও দেশের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। তাই ইতোমধ্যে জলবায়ুর যে পরিবর্তন হয়েছে তার সাথে আমাদের খাপ খাওয়ানোকে গুরুত্ব দিতে হবে। একইসাথে সামনের দিনগুলোতে জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে চলার জন্য যেসব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে সেগুলো হলো–

- বন্যার পানি থেকে মুক্ত থাকার জন্য উঁচু জায়গায় বা মাচা করে ঘর বানাতে হবে।
- বন্যার সময় ভাসমান মাচায় ফসলের চাষ করতে হবে।
- কম পানি বা অতিরিক্ত গরমেও টিকে থাকতে পারে এমন সহনশীল ফসল চাষ করতে হবে। যেমন– খরা সহনশীল ধান।
- খরার সময় পানি পাওয়ার জন্য বর্ষায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা।
- বেশি বেশি করে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে।
- সমুদ্র উপকূলে বাঁধ নির্মাণ করা ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১. শূন্যস্থান পূরণ করি

ক) বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকে .... অবস্থিত।

খ) তীব্র তাপদাহের কারণে ফসল উৎপাদন ....পায়।

গ) বায়ুর আর্দ্রতা জলবায়ুর একটি ....।

ঘ) যত উঁচুতে উঠা যায় তাপমাত্রা তত ....।

২. শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নির্বাচন করি

	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
ক) শীতকালে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়।		
খ) স্থলভাগে ওঠার পর ঘূর্ণিঝড় ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে।		
গ) বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে খরা বেশি হয়।		
ঘ) আকাশের অবস্থা দেখে আবহাওয়া সম্পর্কে জানা যায়।		

৩. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক) জলবায়ুর উপাদানগুলোর নাম লেখো।

খ) আবহাওয়া ও জলবায়ুর তিনটি পার্থক্য লেখো।

গ) কালবৈশাখী ঝড় কেন হয়?

ঘ) জলবায়ু পরিবর্তনের পাঁচটি কারণ লেখো।

৪. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

ক) জলবায়ু পরিবর্তনের নিয়ামকগুলো আলোচনা করো।

খ) জলবায়ু পরিবর্তনে গ্রিনহাউস প্রভাব ব্যাখ্যা করো।

গ) জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো কী কী?

ঘ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তা আলোচনা করো।

অধ্যায় ১২

আমাদের জীবনে প্রযুক্তি

দৈনন্দিন জীবনে সকল ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে এমন কোনো জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগেনি। এ অধ্যায়ে প্রযুক্তি কীভাবে ক্রমান্বয়ে বিকশিত হচ্ছে তা আমরা জানব।

১. ক্রমবিকাশমান প্রযুক্তির উন্নয়ন

আদিমযুগে মানুষ পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করত। মূলত চাকা আবিষ্কারের পর থেকে ধীরে ধীরে যাতায়াত ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। যেমন– গরুর গাড়ি, ঠেলাগাড়ি থেকে শুরু করে রিকশা, বাস, রেলগাড়ি, মেট্রোরেল ইত্যাদির ব্যবহার স্থলপথে দেখতে পাই। এছাড়াও আধুনিক যুগের চমকপ্রদ আবিষ্কার হচ্ছে চালকবিহীন গাড়ি, উড়ুক্কু গাড়ি ইত্যাদি। এভাবে যোগাযোগ, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, খেলাধুলা ও বিনোদনেও প্রযুক্তির ক্রমবিকাশমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

? দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্রযুক্তির ক্রমবিকাশকে কীভাবে চিহ্নিত করব?

কাজ: জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ক্রমবিকাশমান প্রযুক্তির তালিকা তৈরি

যা করতে হবে:

১. নিচে দেখানো ছকের মতো করে খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

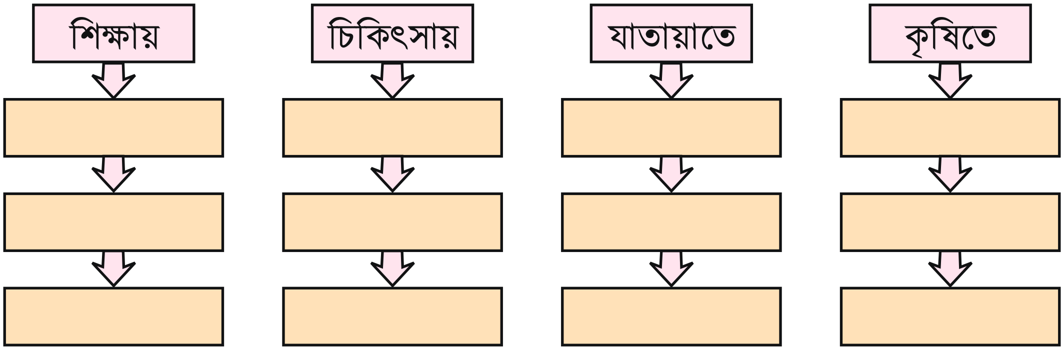

২. ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের তালিকা তৈরি করি। প্রথমে পুরাতন প্রযুক্তি দিয়ে শুরু করি এবং নতুন প্রযুক্তি দিয়ে শেষ করি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

সারসংক্ষেপ

আমরা যোগাযোগ, শিক্ষা, কৃষি এবং চিকিৎসায় বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জেনেছি। নানাভাবে এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা আরামদায়ক ও সুন্দর জীবনযাপন করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে প্রযুক্তি আমাদের জীবনমানের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

ক্রমবিকাশমান প্রযুক্তি সম্পর্কে আরও কিছু জানি

যোগাযোগে প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ

প্রযুক্তির সবচেয়ে দ্রুত উন্নয়ন হয়েছে যোগাযোগে। এক সময় কবুতর দিয়ে চিঠিপত্র বিনিময় করা হতো। তারপর ডাক ব্যবস্থার প্রথম দিকে ঘোড়া দিয়ে চিঠি ও দলিল পরিবহন করা হতো। আধুনিক কালে টেলিগ্রাফ, ফ্যাক্স ও টেলিফোন ইত্যাদি যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিপ্লব বয়ে আনে। এখন বিভিন্ন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যেমন– মোবাইল, ইমেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক, মেসেঞ্জার, ইনস্টাগ্রাম, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি)-এর সাহায্যে যোগাযোগ করা হয়।

শিক্ষায় প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ

কলম, কাগজ ও মুদ্রণযন্ত্র উদ্ভাবন থেকে শুরু করে প্রতিদিনই শিক্ষায় প্রযুক্তির নতুন নতুন উদ্ভাবন যুক্ত হচ্ছে। ক্রমবিকাশ চলে আসছে। যেমন– হোয়াইট বোর্ড, ক্যামেরা, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, রোবোটিক্স ও স্মার্ট বোর্ড ইত্যাদি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে ঘরে বসেও অনলাইনে কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। এটি সম্ভব হয়েছে প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে।

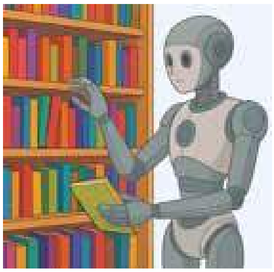

চিকিৎসায় প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ

থার্মোমিটার, স্টেথোস্কোপ থেকে শুরু করে এক্স-রে, আল্ট্রাসনোগ্রাম, ইসিজি, এমআরআই ও সিটিস্ক্যানের মতো প্রযুক্তি চিকিৎসায় ব্যবহার হয়ে আসছে। প্রযুক্তির উন্নয়নে বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম ও নিখুঁত অস্ত্রোপচার রোবোটের মাধ্যমে হচ্ছে। উন্নত বিশ্বে ডাক্তারদের আধুনিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহৃত হচ্ছে। রক্ত, ওষুধ, ইঞ্জেকশন, ভ্যাকসিন এবং রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষার নমুনার মতো

জরুরি স্বাস্থ্য সেবা দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দিচ্ছে ড্রোন। অর্থাৎ চিকিৎসায় প্রযুক্তির উন্নয়ন আমাদের স্বাস্থ্য সেবাকে করেছে সমৃদ্ধ।

কৃষিতে প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ

লাঙল দিয়ে চাষ করা, কাস্তে দিয়ে ফসল কাটা, ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করা, সেচপাম্প দিয়ে জমিতে পানি দেয়া, প্যাডেল থ্রেসার দিয়ে ফসল মাড়াই করার কৃষিযন্ত্র উদ্ভাবন হয়েছে। ফসল উৎপাদন থেকে শুরু করে সংগ্রহ ও সংরক্ষণে কৃষিতে প্রযুক্তি উন্নয়ন লক্ষণীয়। প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে এখন রোবোট ব্যবহার করে চারা রোপণ, ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাটি বিশ্লেষণ, কৃষিজমিতে সার, কীটনাশক ছিটানো, শস্য রোপণ ডিজাইন করা সম্ভব হচ্ছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ছাদবাগান, ফসলের রোগ ও পোকামাকড়ের সঠিক তথ্য ও সমাধান সম্পর্কে জানা যায়। জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়। এই প্রযুক্তিগুলো মানুষকে অধিক পুষ্টিসমৃদ্ধ, পোকামাকড় প্রতিরোধী, উচ্চ ফলনশীল উদ্ভিদ উৎপাদনে সহায়তা করছে।

বিনোদনে প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ

এক সময় খেলাধুলার প্রচার ও বিনোদনে মাধ্যম ছিল রেডিয়ো। টেলিভিশন আবিষ্কারের পরে আমরা খেলা বা অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পেয়েছি। স্যাটেলাইট প্রযুক্তির কল্যাণে আজ দূরের সকল খেলা এবং যেকোনো অনুষ্ঠান ঘরে বসে টেলিভিশন, কম্পিউটার ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সরাসরি উপভোগ করতে পারছি। মূলত প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের কারণেই আমরা এসব সুবিধা ভোগ করছি।

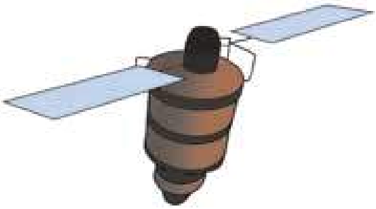

২. ক্রমবিকাশমান প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার

দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া এক মুহূর্ত চলতে পারি না। বিভিন্ন ধরনের ক্রমবিকাশমান প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে জানা আমাদের অতীব প্রয়োজন।

? কীভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্রমবিকাশমান প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করতে পারি?

কাজ: ক্রমবিকাশমান প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের উপায়।

যা করতে হবে:

১. আমরা যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করি, সেগুলো নিরাপদভাবে ব্যবহার করার উপায়গুলো চিন্তা করি। উপায়গুলো নিচের ধারণাচিত্রে লেখো।

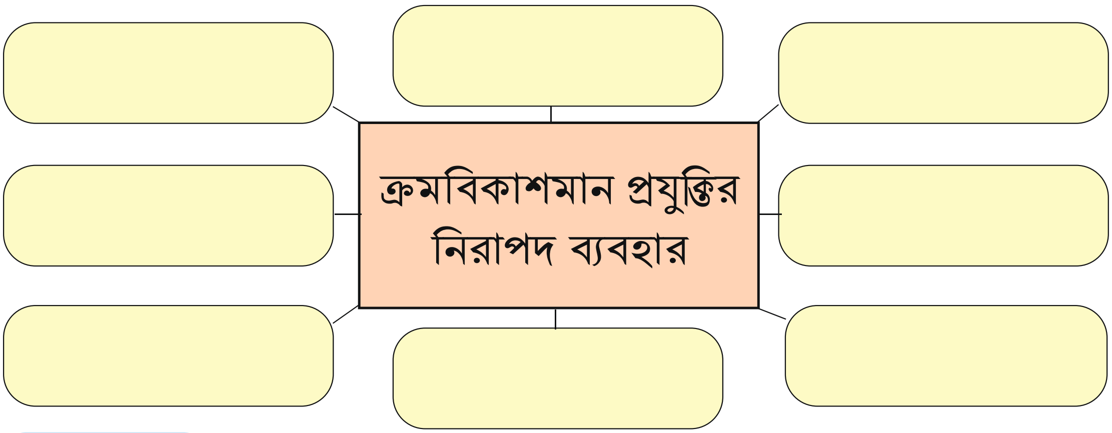

সারসংক্ষেপ

প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের জীবনকে সহজ করলেও এগুলোর যথেচ্ছ ব্যবহার আমাদের জীবনে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। তাই প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করতে হবে।

ক্রমবিকাশমান প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে আরও কিছু জানি

ক্রমবিকাশমান প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রত্যেকটি প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের দেওয়া ব্যবহারবিধি ভালোভাবে জানতে হবে।

রোবোট

রোবোট হলো এমন একটি মেশিন বা যন্ত্র, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে। যে কাজ সাধারণত মানুষের কাছে কঠিন, সময় ও শ্রম সাপেক্ষ কাজে রোবোট ব্যবহার করা হয়। রোবোট শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানে, বাসা সাজানোর কাজে, সামরিক বাহিনীতে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে, কৃষিক্ষেত্রে, কলকারখানায়, অফিস, সংস্কৃতি ও বিনোদনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

রোবটের নিরাপদ ব্যবহারে–

- যে কাজের জন্য রোবটটি তৈরি করা হয়, সে কাজেই যেন ব্যবহার করা হয়।
- রোবোট পরিচালনাকারীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিতে হবে।
- রোবোটের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, যাতে তা সব সময় সচল ও নিরাপদ থাকে।
- রোবোট ব্যবহারের আগে তা পরীক্ষা ও যাচাই করে দেখা উচিত, যেন কোনো ত্রুটি না থাকে।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স (Artificial Intelligence)

আমরা অনলাইনে মোবাইল ফোন ও কম্পিউটারে যে সমস্ত কার্টুন বা ভিডিয়ো বেশি দেখি, পরবর্তী সময়ে আবার সে ডিভাইসগুলো চালু করার সাথে সাথে সে-জাতীয় কার্টুন বা ভিডিয়ো কেন আমার সামনে আসে? চিন্তা করে দেখি। এটা সম্ভব হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারণে। বর্তমানে প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত পর্যায় হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি আজকাল– কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদনসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এআই বা Artificial Intelligence-এর নিরাপদ ব্যবহারে–

- এআই সিস্টেমে সঠিক এবং সত্য তথ্য ব্যবহার করতে হবে।
- সম্পূর্ণ অনুমতি না থাকলে, কোনো ব্যক্তিগত তথ্য এআই সিস্টেমে ব্যবহার করা উচিত নয়।
- এআই ব্যবহারকারীকে সঠিকভাবে এটি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR–Virtual Reality)

প্রকৃত অর্থে বাস্তব নয় কিন্তু বাস্তবের চেতনা উদ্রেককারী বিজ্ঞাননির্ভর কল্পনাকে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা কল্পবাস্তবতা বলে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ, বিনোদন ইত্যাদির অবাস্তব ক্ষেত্রকে বাস্তবের ন্যায় ত্রিমাত্রিকভাবে দেখানো যায়। ভার্চুয়াল রিয়েলিটির নিরাপদ ব্যবহারে–

- ভিআর ডিভাইস ব্যবহারের পূর্বে তার নির্দেশিকা ও সতর্কতা সম্পর্কে জানতে হবে।
- মানসিক চাপ সৃষ্টি হয় এমন বিষয়বস্তু এড়িয়ে চলতে হবে, প্রয়োজনে বিরতি নিয়ে দেখতে হবে।

● মোশন সিকনেস বা গতি-অসুস্থতা যেমন– মাথাব্যথা বা চোখের ক্লান্তি বোধ হলে ৩০-৬০ মিনিট বিরতি নিতে হবে।

● চোখে বিশেষ কন্টাক্ট লেন্স বা 3D চশমা পরতে হবে।

অটোমেশন

আমরা বাস্তবে বা ভিডিয়োতে দেখতে পাই বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকটি ভরার সাথে সাথে মোটরটি বন্ধ হয়ে যায়। আবার পানি শেষ হওয়ার সাথে সাথে মোটরটি চালু হয়। অন্যদিকে হাতের স্পর্শ ছাড়া খাদ্য বা ওষুধ তৈরি হয়। এই যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ হয় এটিই হলো অটোমেশন। বর্তমান যুগে সকল শিল্পকারখানায় উৎপাদনে অটোমেশন ব্যবহার করা হয়। অটোমেশনের নিরাপদ ব্যবহারে–

✓ সিস্টেমটি সঠিকভাবে কার্যকর আছে কি না তা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।

✓ ব্যবহারকারীকে প্রশিক্ষিত হতে হবে এবং অটোমেশন ব্যবহারে সচেতন হতে হবে।

ড্রোন

ড্রোন হলো এক ধরনের উড়ন্ত রোবোট, যা মানুষ দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ড্রোন তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোকে সহজ করা। ড্রোনের নিরাপদ ব্যবহারে–

✓ ড্রোন চালানোর জন্য নিরাপত্তা এবং ব্যবহারের বিধিনিষেধ অবশ্যই জানা দরকার।

✓ ড্রোন চালানোর সময় এটিকে সর্বদা নজরদারিতে রাখতে হবে।

✓ একটি ড্রোনের আশপাশে অন্য কোনো ড্রোন চালানো যাবে না।

✓ ড্রোন ব্যবহারকারীকে সঠিকভাবে ড্রোন ব্যবহারের প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

প্রত্যেকটা কম্পিউটার বা নেটওয়ার্কেরই নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে, কেউ যেন সেই নিরাপত্তার দেয়াল ভেঙে ঢুকতে না পারে সেজন্য নিরাপদ ব্যবহার জানা জরুরি।

৩. কম্পিউটার পরিচিতি

তথ্য-প্রযুক্তির যুগে কম্পিউটার হলো গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। বর্তমানে কম্পিউটার ব্যবহার করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সহজে করা যায়।

? কম্পিউটারে কী কী অংশ আছে?

কাজ: কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ শনাক্তকরণ

যা করতে হবে

১. চিত্রটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি।

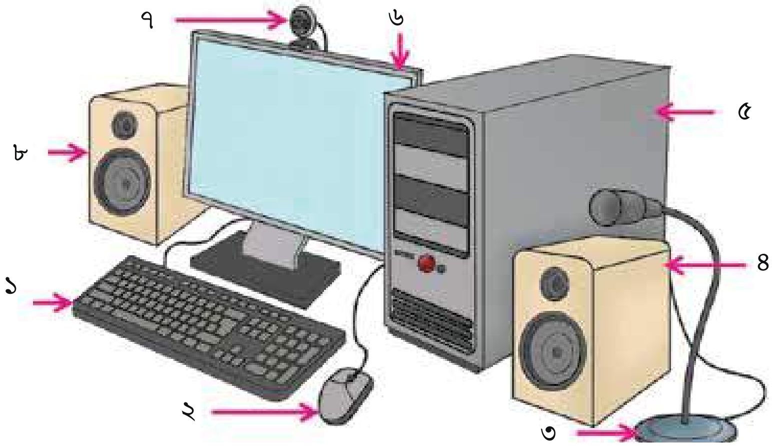

২. চিত্রে নির্দেশিত ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী খাতায় কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের নাম তালিকা আকারে লেখো।

৩. তালিকাটি পাশের সহপাঠীর সাথে মিলিয়ে নিই।

৪. শিক্ষকের সহায়তায় বাস্তবে একটি কম্পিউটার বা ল্যাপটপের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করি।

৫. তালিকার সাথে বাস্তবে কম্পিউটার বা ল্যাপটপের বিভিন্ন অংশ মিলিয়ে দেখি।

কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে আরও কিছু জানি

কম্পিউটার হলো একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যা খুব দ্রুত ও নির্ভুলভাবে বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক ও যৌক্তিক সমস্যা সমাধান করতে পারে। কম্পিউটার পরিচালনার জন্য হার্ডওয়্যার ও সফ্‌টওয়্যার প্রয়োজন হয়।

হার্ডওয়্যার

কম্পিউটারের যেসব উপকরণ দেখা বা ধরা যায় সেসব যন্ত্রাংশকেই একত্রে হার্ডওয়্যার বলে। যেমন– সিপিইউ, মনিটর, কিবোর্ড, মাউস, প্রিন্টার, স্ক্যানার, স্পিকার ইত্যাদি।

সফ্‌টওয়্যার

সফ্‌টওয়্যার হলো একধরনের প্রোগ্রাম বা নির্দেশনা যা কম্পিউটারকে নির্দিষ্ট কাজ করতে সহায়তা করে। সফ্‌টওয়্যার দুই ধরনের, যথা– সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন সফ্‌টওয়্যার। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী শ্রেণিতে বিস্তারিত জানব।

কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অংশ আছে। এই অংশগুলো ছাড়া কম্পিউটার কাজ করতে পারে না।

কম্পিউটারের প্রধান ৪টি অংশ হলো–

ক. ইনপুট ইউনিট

খ. প্রসেসিং ইউনিট

গ. মেমোরি বা স্টোরেজ ইউনিট

ঘ. আউটপুট ইউনিট।

৪. কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের কাজ

কম্পিউটারের কোনো অংশ একা কাজ করতে পারে না। বিভিন্ন অংশের কাজের সমন্বয়ের মাধ্যমেই কম্পিউটার কাজ করে থাকে।

কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের কাজ কী কী?

কাজ: কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের কাজ অনুসন্ধান

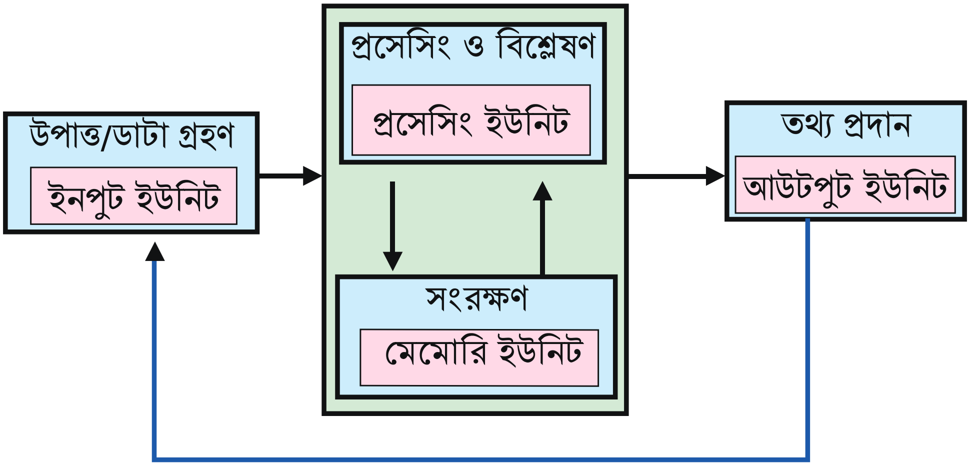

কম্পিউটার সংগঠন

যা করতে হবে

১. নিচে দেখানো ছকের মতো করে খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

২. ছকের বামপাশের নির্দেশনামতো শিক্ষকের সহায়তায় কাজটি করি। কাজটি করার সময় কোন অংশ দ্বারা কী কী কাজ সম্পাদন হচ্ছে তা ছকে লিখি। কাজটি করার সময় উপরের কম্পিউটার সংগঠনের চিত্রটি দেখি এবং চিন্তা করে লিখি।

কাজ	কম্পিউটারের অংশের নাম (ইউনিট)
ক. ৩+২ কম্পিউটারে লিখি।	
খ. যোগফল ৫ কোথায় সম্পন্ন হলো।	
গ. ৫ কোথায় সংরক্ষিত হলো।	
ঘ. ফলাফল ৫ কোথায় দেখা গেল।	

৩. ডানপাশের কলামে কম্পিউটারের যে অংশগুলোর নাম লিখেছি তা সহপাঠীর সাথে আলোচনা করি এবং মিলিয়ে নিই।

সারসংক্ষেপ

কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের কাজের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। প্রথমে কম্পিউটারে ডাটা ইনপুট ইউনিটের মাধ্যমে প্রবেশ করে, সেটি ডাটা প্রক্রিয়াকরণ হয়ে প্রসেসিং ইউনিটের মাধ্যমে মেমোরি ইউনিটে সংরক্ষিত হয়। সর্বশেষে আউটপুট ইউনিটের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা হয়। এভাবে কম্পিউটার তার বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করে কাজ করে থাকে।

কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের কাজ সম্পর্কে আরও কিছু জানি

ক. ইনপুট ইউনিট

কম্পিউটারে তথ্য দেয়ার জন্য আমরা যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি, সেগুলো হলো ইনপুট ইউনিট। উদাহরণ– কীবোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, ওয়েবক্যামেরা ইত্যাদি।

কিবোর্ড (Keyboard): কোনো কিছু লেখা বা টাইপ করার কাজে ব্যবহার করি।	
মাউস (Mouse): কোনো কিছুতে ক্লিক করা, স্ক্রল আপ ও ডাউন করার কাজে ব্যবহার করে থাকি।	
স্ক্যানার (Scanner): কোনো ডকুমেন্টকে সফ্‌টকপিতে রূপান্তর করতে এবং কারো কাছে পাঠাতে আমরা স্ক্যানার ডিভাইস ব্যবহার করে থাকি।	
মাইক্রোফোন (Microphone): ভয়েস ইনপুট করার জন্য আমরা মাইক্রোফোন ব্যবহার করে থাকি।	
ওয়েবক্যাম (Webcam): কোনো কিছুর ছবি তোলা, ভিডিয়ো ধারণ করা ও কারো সাথে ভিডিয়ো যোগাযোগের মাধ্যমে কথা বলা যায়।	

খ. প্রসেসিং ইউনিট

প্রসেসিং ইউনিটের পুরো নাম– Central Processing Unit (CPU)। আমরা কম্পিউটার চালানোর সময় বিভিন্ন নির্দেশনা দিই, সেগুলোকে CPU প্রসেসিং করে ডিসপ্লে বা মনিটরে দেখায়।

গ. মেমোরি বা স্টোরেজ ইউনিট

তথ্য প্রসেসিংয়ের পর এই ইউনিট তথ্য সংরক্ষণ করে রাখতে সাহায্য করে। এই ইউনিট স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। আমরা আমাদের মস্তিষ্কে সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ করি এবং প্রয়োজনে সেই তথ্য মনে করে কাজ করি। কম্পিউটারও আমাদের মস্তিষ্কের মতো কাজ করে। কম্পিউটার মেমোরি ইউনিটের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ করে এবং প্রয়োজনে সেই তথ্য ব্যবহার করে নির্দেশিত কাজ করে।

মেমোরি বা স্টোরেজ ইউনিট দুই ধরনের হয়–

RAM (Random Access Memory): RAM হলো অস্থায়ী মেমোরি।	
ROM (Read Only Memory): ROM হলো স্থায়ী মেমোরি। যেখানে সংরক্ষিত তথ্য কখনো মুছে ফেলা বা পরিবর্তন করা যায় না।	

ঘ. আউটপুট ইউনিট

আউটপুট ইউনিট হলো এমন ডিভাইস যার মাধ্যমে আমরা ডাটা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল দেখতে, পড়তে বা শুনতে পাই।

উদাহরণ : মনিটর, প্রজেক্টর, প্রিন্টার, স্পিকার, হেডফোন ইত্যাদি।

প্রিন্টার (Printer): কোনো তথ্য বা ছবি কাগজে বা ডকুমেন্ট ছাপানোর জন্য প্রিন্টার ব্যবহার করে থাকি।	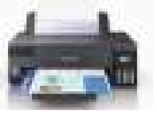
স্পিকার (Speaker): কোনো শব্দ শুনতে চাইলে আমরা স্পিকার ব্যবহার করে থাকি।	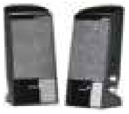
মনিটর (Monitor): কোনো তথ্য, ছবি ও ভিডিয়ো মনিটরে দেখতে পাই।	
হেডফোন (Headphone): কোনো শব্দ শুনতে ও বলতে গেলে আমরা হেডফোন ব্যবহার করে থাকি।	

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দিই

ক) ইঞ্জেকশন বা ভ্যাকসিন দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দিতে ব্যবহৃত যন্ত্র কোনটি?

☐ রোবোট ☐ ড্রোন ☐ অ্যাম্বুলেন্স ☐ মোটরসাইকেল

খ) কেন আমরা কৃষি প্রযুক্তিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স ব্যবহার করব?

☐ ফসলের রোগ ও সঠিক তথ্য জানতে ☐ ফসল সংগ্রহ করতে

☐ জমিতে সার দিতে ☐ শস্য রোপণ করতে।

গ) লিবানের বাবা সৌদি আরবে গিয়েছেন। লিবান তার বাবাকে দেখতে চায় এবং তাঁর সাথে কথা বলতে চায়– এমন পরিস্থিতিতে লিবান কোনটির সহায়তা বেছে নেবে?

☐ টেলিফোন ☐ ইমেইল ☐ ফ্যাক্স ☐ হোয়াটসঅ্যাপ

২. শূন্যস্থান পূরণ করি

ক) বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয় ....।

খ) কম্পিউটার হলো একটি .... যন্ত্র।

গ) এক সময় খেলাধুলার প্রচার ও বিনোদনের মাধ্যম ছিল ....।

ঘ) রোবোট পরিচালনাকারীকে উপযুক্ত .... নিতে হবে।

৩. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক) শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগুলোর নাম লেখো।

খ) কীভাবে এআই (AI)-এর নিরাপদ ব্যবহার করা যায়?

গ) প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ কীভাবে আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ করেছে?

ঘ) কম্পিউটারে ছবি দেখা না গেলে এর কোন অংশটি কাজ করছে না বলে ধরে নিতে হবে?

৪. বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক) কম্পিউটারের প্রধান অংশগুলোর কাজ বর্ণনা করো।

খ) ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত?

গ) ইনপুট ইউনিটে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলোর কাজ সম্পর্কে লেখো।

অধ্যায় ১৩

সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

আমাদের জীবনে প্রযুক্তি অধ্যায়ে আমরা প্রযুক্তির ধারাবাহিক উন্নয়ন এবং এর নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছি। সেখানে প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে যে ধারণা পেয়েছি তা ব্যবহার করে কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আমরা শিখব। একই সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের কৌশল খুঁজে বের করব।

১. দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার

আমরা প্রতিদিন নানা কাজ করি। হিসাব-নিকাশ করা, লেখা, ছবি আঁকা, তথ্য খোঁজা, বার্তা পাঠানো ইত্যাদি। এসব কাজ প্রযুক্তির সাহায্যে আরও সহজ, দ্রুত ও সুন্দরভাবে করা যায়। বিশেষ করে কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন এখন আমাদের জীবনের অপরিহার্য সহায়তাকারী।

? দৈনন্দিন জীবনে আমরা কোন কোন কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করি?

আমরা প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করি। প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করছি।

কাজ: বিভিন্ন কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার করা।

ক. ছবি আঁকা

যা লাগবে: কম্পিউটারে Paint প্রোগ্রাম

যা করতে হবে:

১. কম্পিউটারে Paint প্রোগ্রাম খুলি।

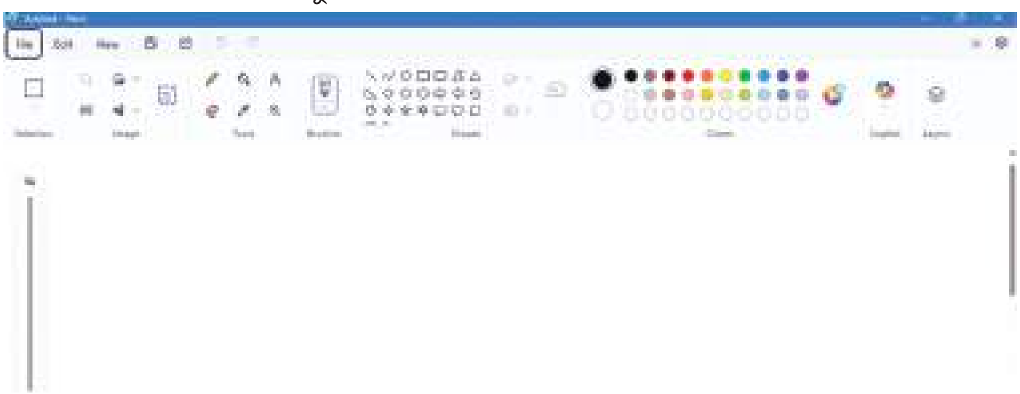

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

২. Paint প্রোগ্রামের Tools, Brush, Shapes, Color ব্যবহার করে ইচ্ছেমতো পতাকা, ফুল, পাখি ইত্যাদি আঁকি।

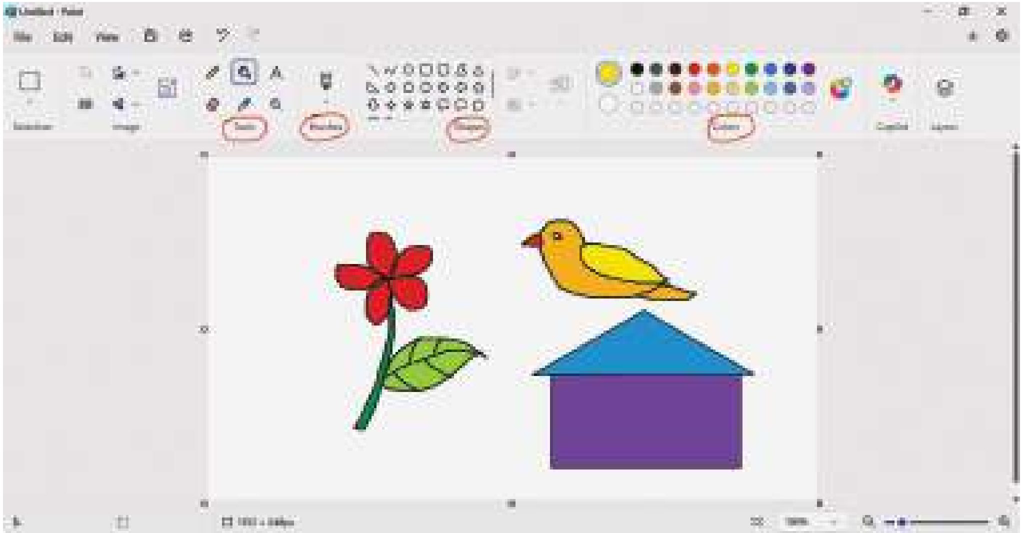

৩. Paint উইন্ডোর উপরের বাম কোণে File মেনুতে ক্লিক করে Save As সাবমেনুতে যাই।

৪. সাবমেনুর ডানপাশে যেকোনো একটি ফাইল টাইপ নির্বাচন করি। যেমন– PNG, JPEG।

৫. ফাইলটির একটি নাম দিই, যেমন– amar chobi।

৬. ফাইলটি কোথায় রাখতে চাই তা নির্বাচন করে Save বাটনে ক্লিক করি।

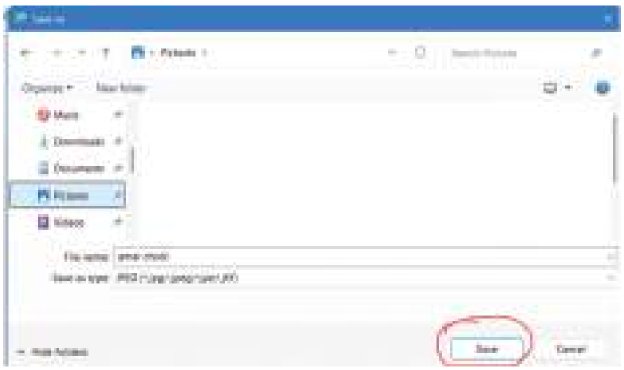

৭. আঁকা ছবিটি প্রিন্ট করে বা প্রজেক্টরের মাধ্যমে শ্রেণিতে উপস্থাপন করি।

খ. ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা।

যা লাগবে: ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন।

যা করতে হবে:

১. কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনে থাকা ব্রাউজার (Google Chrome, Firefox বা Mircrosoft Edge) খুলি।

২. ব্রাউজারের ঠিকানার ঘরে www.google.com অথবা অন্য সার্চ ইঞ্জিনের ঠিকানা লিখে Enter চেপে সার্চ ইঞ্জিনে যাই।

৩. এবার সার্চ ইঞ্জিনের সার্চ বক্সে যা জানতে চাই তা লিখি। যেমন– বাংলাদেশের ফুল, ফল, পাখি ইত্যাদি এবং সার্চ বাটন ক্লিক করি বা Enter চাপি।

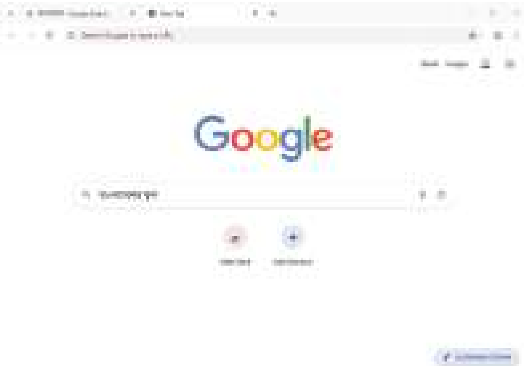

৪. কয়েকটি ওয়েবসাইটের ঠিকানায় ক্লিক করি ও ওয়েবসাইটে দেওয়া প্রয়োজনীয় তথ্য পড়ি।

৫. ওয়েবসাইট হতে সংগৃহীত প্রয়োজনীয় তথ্য খাতায় লেখো।

গ. Word প্রোগ্রাম ব্যবহার করে লেখা

যা লাগবে: কম্পিউটারে Word প্রোগ্রাম।

যা করতে হবে:

১. কম্পিউটারে Word প্রোগ্রাম খুলি।

২. একটি Blank Document নির্বাচন করি।

৩. Word উইন্ডোর খালি পাতায় যেকোনো বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

৪. ইচ্ছেমতো ফন্ট সাইজ, স্টাইল ও রং পরিবর্তন করি।

৫. Word উইন্ডোর উপরের বাম কোণে File মেনুতে ক্লিক করি ও Save As সাবমেনুতে ক্লিক করি।

৬. ফাইলটি কোথায় রাখব তা নির্বাচন করি।

৭. ফাইলটির একটি নাম দিই, যেমন– Fruits of Bangladesh এবং ফাইল টাইপ নির্বাচন করি। যেমন– Word Document

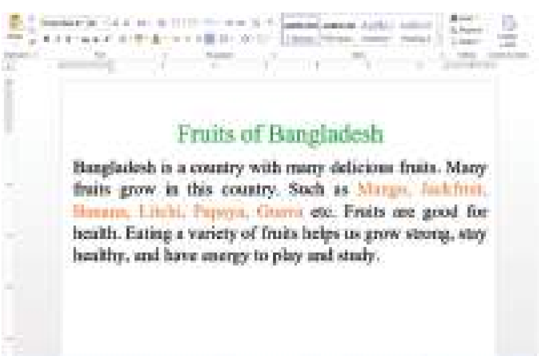

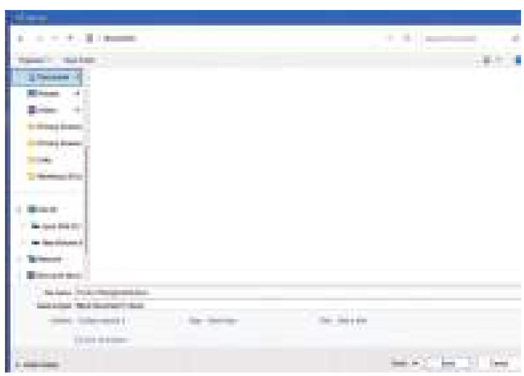

৮. Save বাটনে ক্লিক করি।

সারসংক্ষেপ

দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সহজ করার জন্য আমরা বিভিন্ন প্রযুক্ত ব্যবহার করি। প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম সময়ে ও সহজে সেবা গ্রহণ করতে পারি।

প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আরও কিছু জানি

আমরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছি। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করার মতো আরও প্রযুক্তি রয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরার সাহায্যে অফিস, বিদ্যালয়, দোকান, বাড়ি ও রাস্তায় নজরদারি করা হয়। চোর বা দুষ্কৃতিকারীদের শনাক্ত করে অপরাধ তদন্তের জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। বিয়ে, অনুষ্ঠান, সিনেমার শুটিং, দুর্গম এলাকায় উদ্ধার কাজ, সীমান্ত প্রহরা, বনরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ড্রোন ব্যবহৃত হয়। স্যাটেলাইটের সাহায্যে আবহাওয়ায় পূর্বাভাস, টিভি ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ ও দেশের নিরাপত্তার নজরদারি করা যায়। খাবার গরম করা, কেক-বিস্কুট ইত্যাদি বানানো ও ল্যাবরেটরিতে গবেষণামূলক কাজে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এরকম আরও অনেক প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা কম সময়ে ও সহজে কাজ করতে পারি।

বর্তমানে মোবাইল ফোন ও কম্পিউটার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন– কৃষিপণ্যের বাজার দরজানা, অনলাইনে কেনাকাটা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শপিংমল, ওষুধের দোকানের দৈনন্দিন

বেচাকেনার কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ইউনিক আইডি খোলা, উপবৃত্তির কাজ, শিক্ষার্থীর তথ্য সংরক্ষণ, অভিভাবককে বার্তা প্রেরণ, আপৎকালীন পাঠদানে মোবাইল ফোন ও কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।

এছাড়া অ্যাপ দিয়ে কোনো স্থানের দূরত্ব, স্থান চিহ্নিতকরণ ও কোন রাস্তা দিয়ে কত সময়ের মধ্যে যাওয়া যাবে তা জানা যায়। মোবাইল ফোন ও কম্পিউটার ব্যবহার করে অনলাইন বিল পরিশোধ, টিকিট সংগ্রহ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা যায়। তাছাড়াও সিনেমা ও নাটক দেখা, পত্রিকাও পড়া, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার, গেম, খেলা, ইন্টারনেট ব্যবহার, চ্যাট জিপিটি ব্যবহারসহ আজকাল প্রায় সব ধরনের কাজে কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন ব্যবহৃত হচ্ছে।

২. স্ক্র্যাচ (Scratch) প্রোগ্রামে যৌক্তিক নির্দেশনায় সমস্যার সমাধান

যৌক্তিক নির্দেশনায় সমস্যার সমাধান

আমরা চতুর্থ শ্রেণিতে স্ক্র্যাচের বিভিন্ন উপাদান ও তাদের কাজ সম্পর্কে জেনেছি। ব্লক-কোড দিয়ে কীভাবে প্রোগ্রাম তৈরি করতে হয় সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেয়েছি। এখন আমরা স্ক্র্যাচ প্রোগ্রাম ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার কৌশল জানব।

? ধারাবাহিক নির্দেশনা বা কোড অনুসরণ করে কীভাবে কোনো সমস্যা সমাধান করতে হয়?

যেকোনো কাজ করার জন্য আমরা পরিকল্পনা করে থাকি। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য আমরা ধারাবাহিকভাবে কিছু নিয়ম বা নির্দেশনা মেনে চলি। চলো, ধারাবাহিক নির্দেশনা মেনে নিচের খেলাটি খেলি।

কাজ: হিসাব করি সংখ্যা ধরি

যা করতে হবে:

১। নিচের ছবির মতো ৬-৮ জন দলে গোল হয়ে দাঁড়াই।

২। খেলার শুরুতেই একটি নম্বর ঠিক করে নিই (যেমন– ২৪)।

৩। দলের প্রত্যেককে সরবরাহকৃত ৩টি ছক্কা পর্যায়ক্রমে একসঙ্গে নিক্ষেপ করার সুযোগ দিই।

৪। ছক্কাগুলোতে যে যে নম্বর আসবে তা চার প্রক্রিয়ার (+, -, ×, ÷) যে কয়টি প্রয়োজন ব্যবহার করে হিসাব করি।

৫। এক্ষেত্রে আমরা দলের প্রত্যেকেই হিসাব করি। তবে উত্তর না বলে নিক্ষেপকারী শিক্ষার্থীকে সময় নিয়ে হিসাব করে বলার সুযোগ দিই।

৬। ছক্কা নিক্ষেপ করার পর ছক্কায় ওঠা নম্বর হিসাব করে যার বা যাদের নম্বর পূর্বে ঠিক করা নম্বরের সমান হবে তারাই বিজয়ী হব এবং পরবর্তী রাউন্ডের জন্য নির্বাচিত হব। যাদের নম্বর মিলবে না তারা খেলা থেকে বাদ যাব।

৭। প্রথম রাউন্ডে একাধিক বিজয়ী হলে পুনরায় একটি নির্দিষ্ট নম্বর ঠিক করে খেলা চালিয়ে যাব। খেলায় চূড়ান্তভাবে একজন বিজয়ী হব।

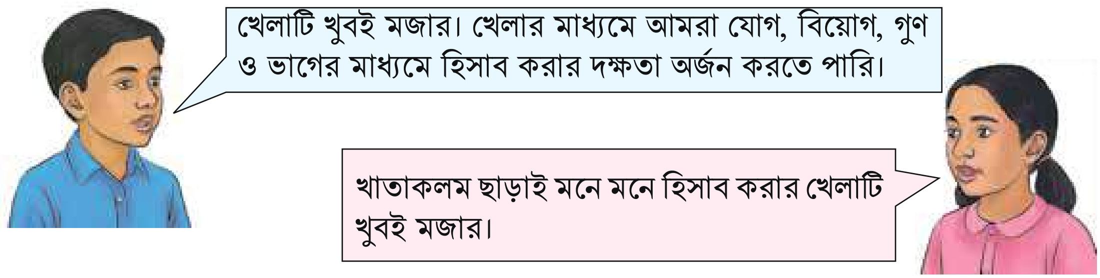

নিচের বিষয় নিয়ে চিন্তা করি

১। ‘হিসাব করি সংখ্যা ধরি’ খেলায় বিজয়ী হওয়ার জন্য কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়েছে?

২। এই খেলা থেকে আমরা কী শিখলাম?

কাজ: স্ক্যাচ প্রোগ্রাম ব্যবহার করে বড়ো সংখ্যা খুঁজে বের করি

যা করতে হবে:

১. ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটারে থাকা ওয়েব ব্রাউজার খুলি। (যেমন– Google Chrome সার্চ বারে scratch.mit.edu লিখে scratch ওয়েবসাইটে প্রবেশ করি। হোমপেজ-এর নিচের দিকে ভাষা ‘বাংলা’ নির্বাচন করি এবং হোমপেজ-এর উপরের দিকে ‘তৈরি করো’ বাটনে ক্লিক করে বাংলা ভাষায় স্ক্যাচ প্রোগ্রাম চালু করি।

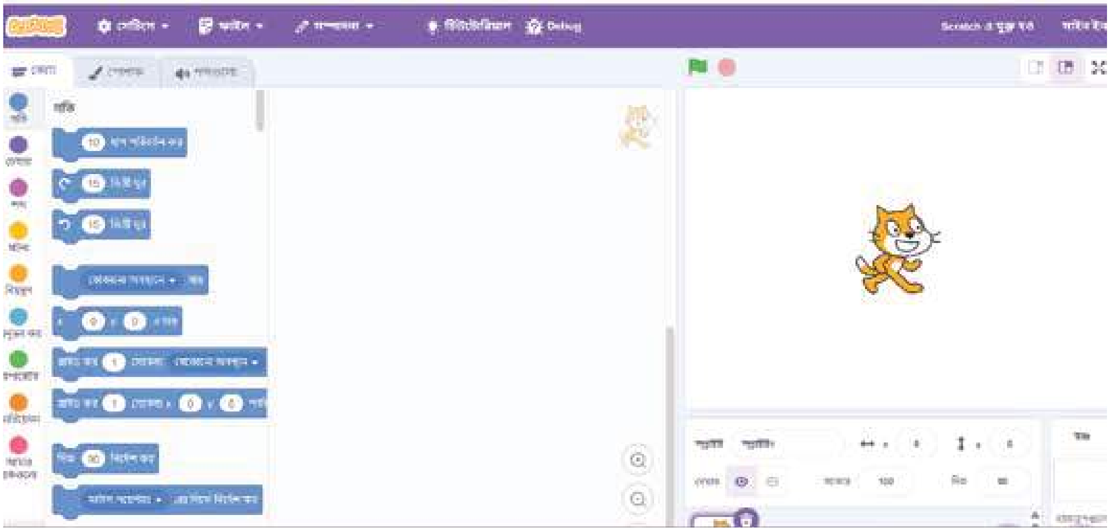

২. এরপর কোড এলাকার ‘ঘটনা’ (Events) এ ক্লিক করি এবং

ব্লকটি টেনে মাঝের স্ক্রিপ্ট এলাকাতে নিয়ে আসি।

৩. এবার কোড এলাকার ‘ভ্যারিয়েবল’ (Variables)-এ ক্লিক করি; আবার ‘একটি ভ্যারিয়েবল তৈরি কর’ তে ক্লিক করি। একটি নতুন উইন্ডো আসবে। এই উইন্ডোর নতুন ভ্যারিয়েবল-এর নিচে ‘সংখ্যা ১’ লিখি এবং ‘ঠিক আছে’ তে ক্লিক করে ‘সংখ্যা ১’ নামে একটি ভ্যারিয়েবল তৈরি করি।

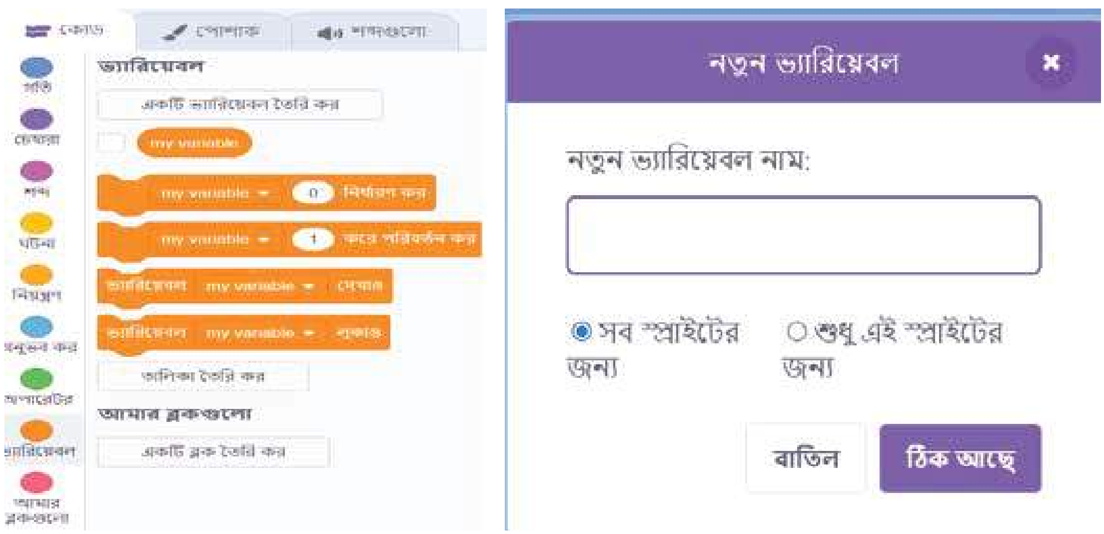

৪. অনুরূপভাবে ‘সংখ্যা ২’ নামে আরও একটি ভ্যারিয়েবল তৈরি করি।

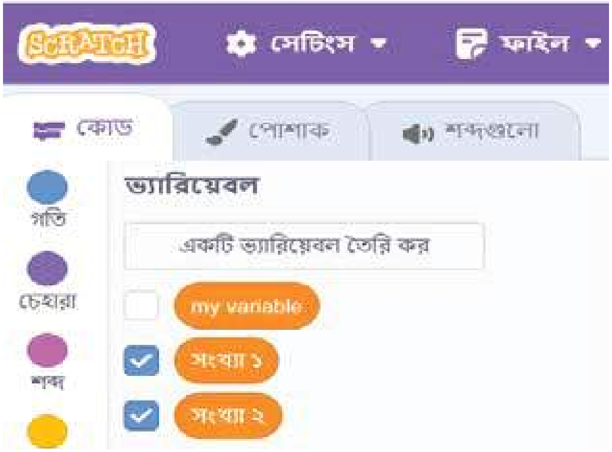

৫. কোড এলাকার 'চেহারা'(Looks) থেকে 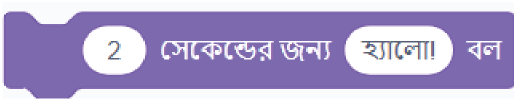 ব্লকটি

স্ক্রিপ্ট এলাকায় এনে কোডটি সাথে যুক্ত করি।

৬. এবার 'হ্যালো!' লেখা পরিবর্তন করে লেখো 'সংখ্যা ১ কত'?

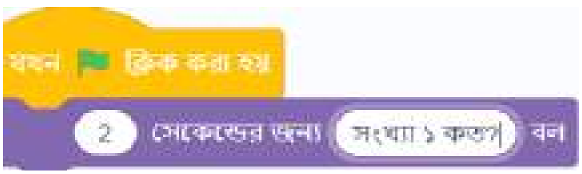

৭. কোড এলাকার 'অনুভব করো' (Sensing) থেকে

ব্লকটিকে স্ক্রিপ্ট এলাকায় এনে আগের ব্লকগুলোর নিচে যুক্ত করি।

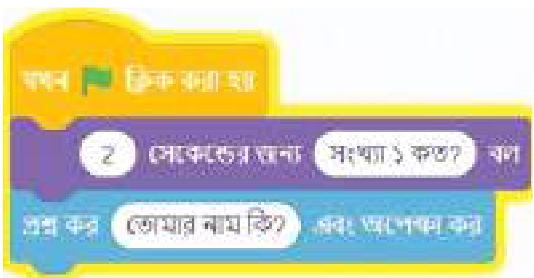

৮. এরপর 'ভ্যারিয়েবল' (Variables) থেকে 'সংখ্যা ১' কে টেনে এনে 'তোমার নাম কী'? লেখার উপর ছেড়ে দিই।

৯. ‘ভ্যারিয়েবল’ (Variables) থেকে 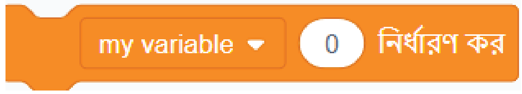

ব্লকটিকে স্ক্রিপ্ট এলাকায় এনে আগের ব্লকগুলোর নিচে যুক্ত করি।

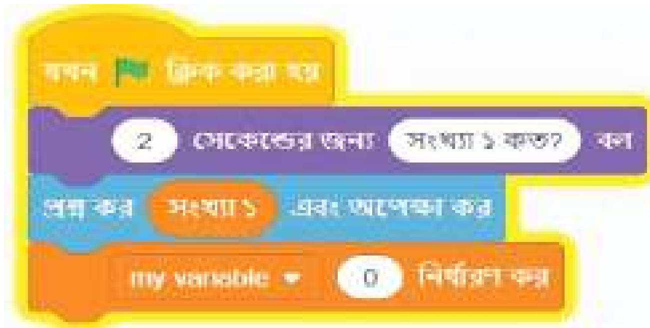

১০. স্ক্রিপ্ট এলাকায় ‘my variable’ লেখার উপর ক্লিক করে ‘সংখ্যা ১’ নির্বাচন করি।

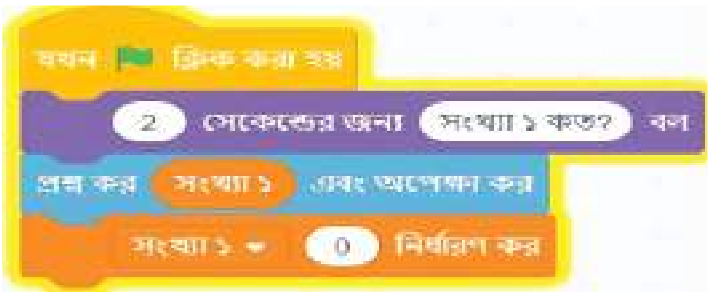

১১. এবার ‘অনুভব কর’ (Sensing) থেকে

ব্লকটি স্ক্রিপ্ট এলাকায় টেনে এনে ০ এর উপর ছেড়ে দিই।

১২. অনুরূপভাবে ধাপ ৫ থেকে ধাপ ১১ অনুসরণ করে ‘সংখ্যা ২’-এর ভ্যারিয়েবল তৈরি করি।

১৩. এবার ‘চেহারা’(Looks) থেকে

ব্লকটিকে স্ক্রিপ্ট এলাকায় এনে আগের ব্লকগুলোর সাথে যুক্ত করি।

১৪. হ্যালো! শব্দের স্থানে লেখো ‘বড়ো সংখ্যাটি হলো’

১৫. এরপর 'নিয়ন্ত্রণ' (Control) থেকে

ব্লকটিকে স্ক্রিপ্ট এলাকায় এনে আগের ব্লকগুলোর সাথে যুক্ত করি।

১৬. ‘অপারেটর’ (Operators) থেকে

ব্লকটিকে স্ক্রিপ্ট এলাকায় এনে

ব্লকের উপর ‘যদি ও তাহলে’-এর মাঝে নিচের ছবির মতো বসাই।

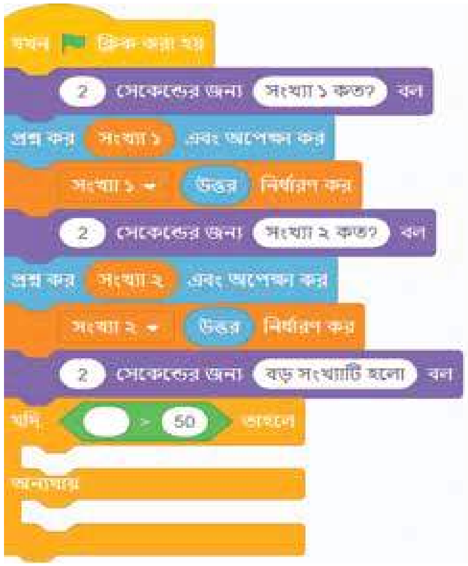

১৭. ‘ভ্যারিয়েবল’ (Variables) থেকে ‘সংখ্যা ১’ ও ‘সংখ্যা ২’ স্ক্রিপ্ট এলাকায় এনে

ব্লকের উপর যদি ও তাহলে এর মাঝে নিচের ছবির মতো ব্লকের উপর বসাই।

১৮. এরপর কোড এলাকার ‘চেহারা’ (Looks) থেকে 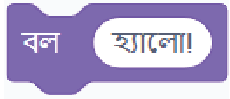

ব্লকটিকে স্ক্রিপ্ট এলাকায় এনে নিচের ছবির মতো বসাই।

১৯. এবার ‘হ্যালো!’ লেখার স্থানে ‘ভ্যারিয়েবল’ থেকে ‘সংখ্যা ১’ স্ক্রিপ্ট এলাকায় এনে নিচের ছবির মতো বসাই।

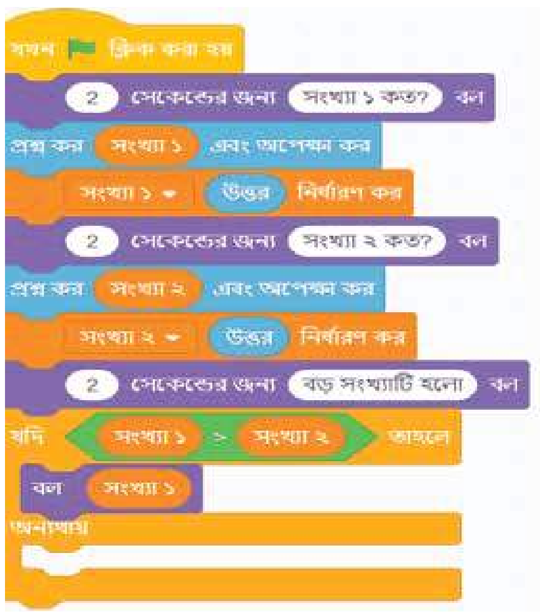

২০. একইভাবে আরেকটি

ব্লক এনে বসাই।

২১. এরপর 'হ্যালো!' লেখার স্থানে কোড এলাকার 'ভ্যারিয়েবল' (Variables) থেকে 'সংখ্যা ২' নিচের ছবির মতো বসাই।

২২. এবার শুরুর দিকের

ব্লক এর নিচে কোড এলাকার 'ভ্যারিয়েবল' (Variables) থেকে

ব্লকটি এনে ছেড়ে দিই এবং my variable লেখার উপর ক্লিক করে 'সংখ্যা ১' নির্ধারণ করি। পাশে ০ লেখাটি মুছে দিই।

২৩. একইভাবে, ঠিক তার নিচে 'ভ্যারিয়েবল' (Variable) থেকে

ব্লকটি স্ক্রিপ্ট এলাকায় এনে ছেড়ে দিই এবং my variable লেখার উপর ক্লিক করে 'সংখ্যা ২' নির্ধারণ করি। পাশে ০ লেখাটি মুছে দিই।

২৪. এবার মঞ্চের উপরদিকে থাকা উপর ক্লিক করি। স্প্রাইট প্রশ্ন করবে 'সংখ্যা ১ কত?' মঞ্চের নিচের দিকে ফাঁকা স্থানে যেকোনো একটি সংখ্যা যেমন-২৫ লিখি।

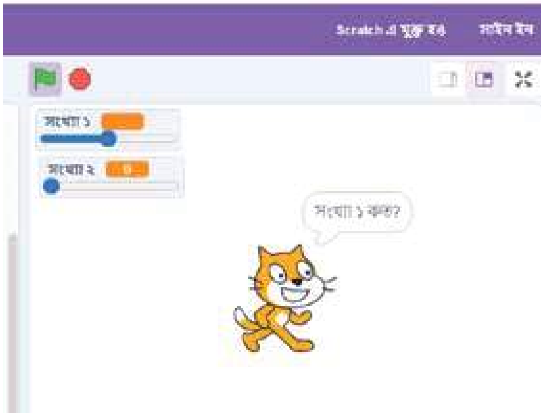

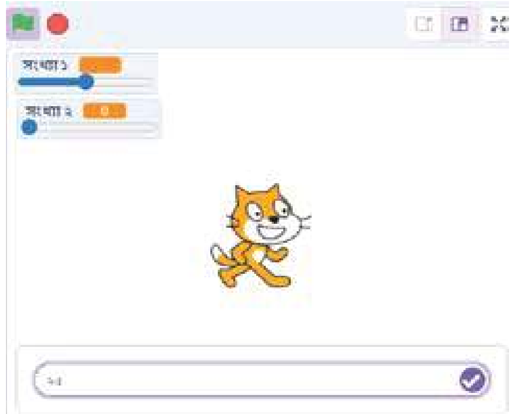

২৫. তারপর টিক চিহ্নের উপর ক্লিক করি। স্প্রাইট আবার প্রশ্ন করবে 'সংখ্যা ২ কত?' মঞ্চের নিচে ফাঁকা স্থানে ২৫ থেকে বড়ো যেকোনো একটি সংখ্যা যেমন–৬৩ লিখি। তারপর টিক চিহ্নের উপর ক্লিক করি।

২৬. স্প্রাইট উত্তর করবে 'বড়ো সংখ্যাটি হলো' ৬৩।

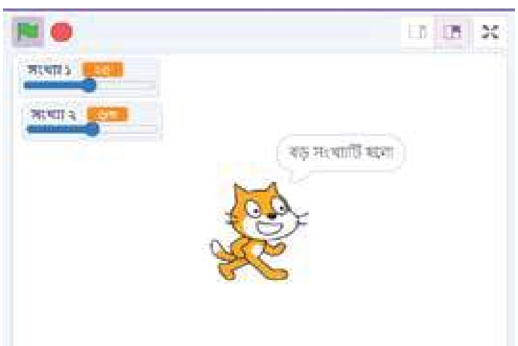

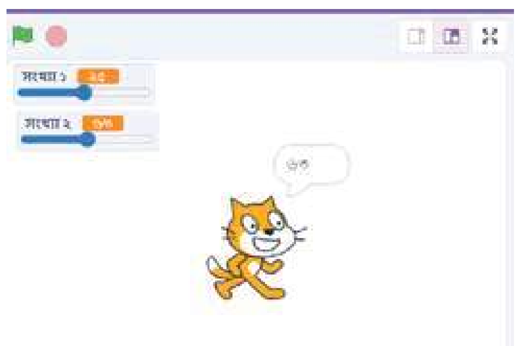

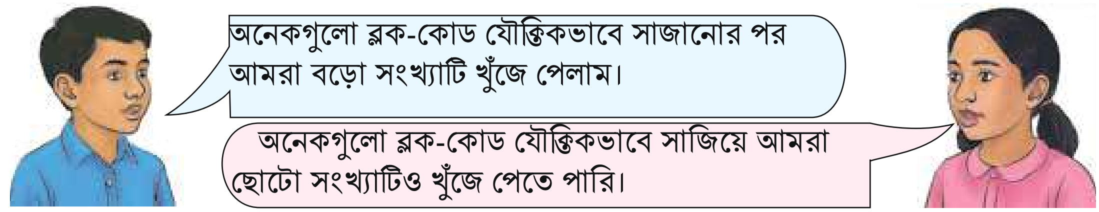

সারসংক্ষেপ

বড়ো সংখ্যাটি নির্ণয়ের জন্য অনেকগুলো ব্লক-কোড যৌক্তিকভাবে একত্রে সাজানোই হলো প্রোগ্রাম। আর কোনো নির্দিষ্ট কাজ বা সমস্যা সমাধানের জন্য কোড বা কোডসমূহকে যৌক্তিকভাবে সাজানোর প্রক্রিয়াই হলো প্রোগ্রামিং। পরবর্তী সময়ে আমরা কোড ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধান করতে শিখব।

৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করেই সব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিজ্ঞান আমাদের প্রকৃতি, প্রাণী, বস্তু, শক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। আর প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যবহার করে মানুষের কাজ সহজ করার উপায় বের করা।

? প্রযুক্তির উদ্ভাবনে আমরা কীভাবে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যবহার করি?

কাজ: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়

যা করতে হবে:

১. নিচের ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

২. বিভিন্ন প্রযুক্তিতে বিজ্ঞানের কোন কোন জ্ঞান ব্যবহার করা হয়েছে তা খুঁজে বের করি। উদাহরণ হিসেবে একটি করে দেয়া আছে।

প্রযুক্তি	বৈজ্ঞানিক জ্ঞান
টেলিভিশন	বিদ্যুৎশক্তি, আলোকশক্তি ও শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
গাড়ি	
বৈদ্যুতিক বাতি	
রেফ্রিজারেটর	
বৈদ্যুতিক পাখা	

৩. প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করি।

সারসংক্ষেপ

বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে ঘটা ঘটনা-সম্পর্কিত জ্ঞান, যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করে। প্রযুক্তি হলো আমাদের জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ। প্রযুক্তি মানুষের জীবনের মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পণ্য, যন্ত্রপাতি এবং পদ্ধতির উদ্ভাবন করে।

প্রযুক্তির সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে আরও কিছু জানি

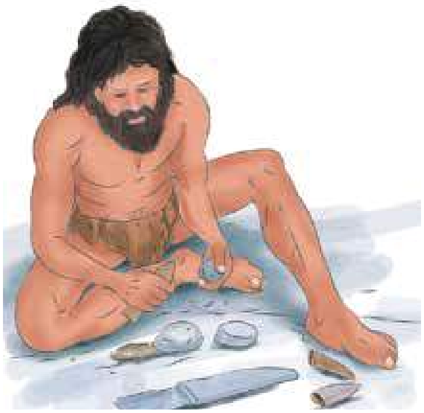

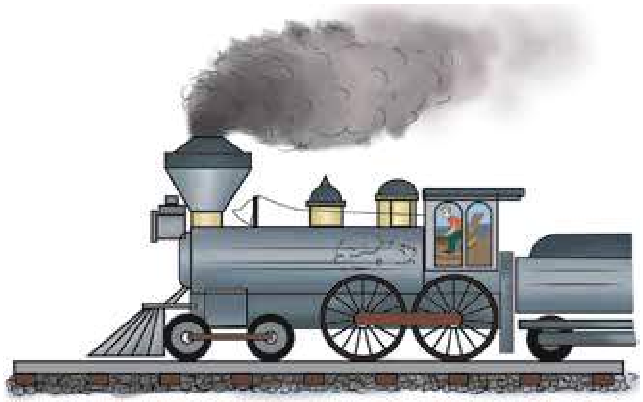

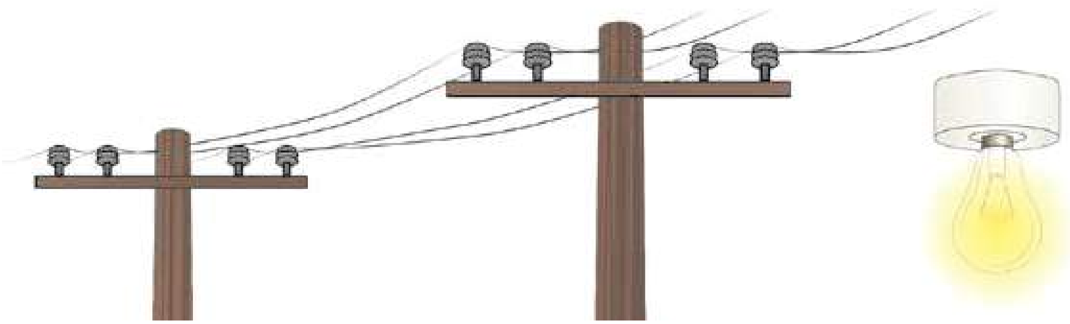

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করা হয়েছে। জীবনকে উন্নত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য বিদ্যুৎকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন হচ্ছে। মানুষ পাথরের হাতিয়ার, আগুন, পোশাক, ধাতব যন্ত্রপাতি এবং চাকার মতো সরল প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছেন। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত জলীয় বাষ্পের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেছে। এই বাষ্পীয় ইঞ্জিন কলকারখানা, রেলগাড়ি ও জাহাজ চালাতে ব্যবহার হতো। পরবর্তীকালে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প, পরিবহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তির ধারাবাহিক উন্নতি হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার সময়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকেন। যেমন–দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা মহাকাশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। খালি চোখে দেখা যায় না, মহাকাশের এমন বস্তু অনুসন্ধানে বিজ্ঞানীরা অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। প্রযুক্তি শুধু বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতিও প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে।

৪. ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রযুক্তির গুরুত্ব

দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা প্রযুক্তি-নির্ভর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি। শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্পসহ প্রতিটি খাতে প্রযুক্তির প্রয়োগ লক্ষণীয়। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নত ও গতিশীল জীবন পরিচালনায় প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রযুক্তি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

কাজ: ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রযুক্তির গুরুত্ব অনুধাবন

যা করতে হবে:

১. নিচের ছকের মতো করে খাতায় একটি ছক আঁকি।

২. নিচের ঘটনাটি চিন্তা করে ছকটি পূরণ করি।

টেলিভিশনে আবহাওয়ার সংবাদে জানা গেল, সমুদ্র উপকূলে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হবে। তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে এমন সংবাদ পাওয়ায় পর ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কী উপকার হলো?

ব্যক্তির উপকার	সমাজের উপকার	রাষ্ট্রের উপকার

৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করি এবং সহপাঠীর কাছ থেকে নতুন কোনো ধারণা পেলে তা লিখে রাখি।

সারসংক্ষেপ

উপরের ঘটনায় আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা রাডার স্টেশনের মাধ্যমে বুঝতে পারলেন, সমুদ্র উপকূলে বায়ুচাপ ভীষণভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এই উপাত্তকে বিশ্লেষণ করে জানালেন যে প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস হবে।

এ তথ্য টেলিভিশনে প্রচারিত হলো। জনসাধারণ তা দেখে পরিকল্পনার সুযোগ পেল। সমুদ্র উপকূলের জনসাধারণ, প্রাণী, মাছ ধরার নৌযান নিরাপদ আশ্রয়ে বা সাইক্লোন সেন্টারে চলে এল। এতে ব্যক্তিগত জীবন যেমন রক্ষা পেল, তেমনি এলাকাবাসী তাদের সম্পদ ও জীবন রক্ষার কাজে এই তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপকৃত হলো। সমুদ্রের জাহাজগুলো নিরাপদ আশ্রয়ে থাকায় রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা হলো।

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রযুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে আরও কিছু জানি

পৃথিবীর অনেক দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে । সম্পদ খোঁজা ও আহরণের জন্য প্রযুক্তি না থাকলে ঐ সম্পদ তাদের কোনো কাজে আসে না। মাটির নিচে, পাহাড়ে ও সমুদ্রে সম্পদ খোঁজা ও আহরণের জন্যও যথাযথ প্রযুক্তির প্রয়োজন।

আমাদের দেশের খাদ্যের চাহিদায় ইরি, ব্রি এবং বিআর ৩৩ উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ধান ও অন্যান্য ফসল মূলত কৃষিক্ষেত্রে জিন প্রযুক্তির অবদান।। বাংলাদেশের কিছু এলাকার খাদ্যাভাব মোকাবেলায় কৃষিপ্রযুক্তি অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এখন আর সেখানে দুর্ভিক্ষ হয় না।

এছাড়াও শিক্ষা, চিকিৎসা, খেলাধুলা ও বিনোদনে বিভিন্ন প্রযুক্তি আমাদের জীবনে অবদান রাখছে। অর্থাৎ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫. ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রযুক্তিনির্ভর সেবা গ্রহণ ও প্রদান

কোনো দেশ কতটা উন্নত সেটা নির্ভর করে সে দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কত দ্রুত সেবা দিতে পারে তার ওপর। প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে কোনো কোনো দেশের নাগরিক সেবার প্রায় শতভাগই প্রযুক্তিনির্ভর।

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রযুক্তিনির্ভর কী কী সেবা গ্রহণ ও প্রদান করতে পারি?

কাজ: প্রযুক্তিনির্ভর সেবা গ্রহণ ও প্রদানের তালিকা তৈরি

যা করতে হবে:

১. আমরা প্রযুক্তিনির্ভর যেসব সেবা গ্রহণ করি নিচে তার তালিকা তৈরি করি।

প্রযুক্তিনির্ভর কী কী সেবা গ্রহণ করি

২. নিচের ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

৩. উপরে লিখিত প্রযুক্তিনির্ভর সেবাগুলো থেকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যবহৃত সেবাগুলো চিহ্নিত করে নিচের ছকে লিখি। কোনো কোনো সেবা একাধিক কলামে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ব্যক্তি পর্যায়ে প্রযুক্তিনির্ভর সেবা	সমাজ পর্যায়ে প্রযুক্তিনির্ভর সেবা	রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রযুক্তিনির্ভর সেবা

রাষ্ট্রীয় সেবাসম্পর্কিত তথ্য

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের যেসব জরুরি সেবা দিয়ে থাকে তার তালিকা ও কল সেন্টারের নম্বর।

ক্রমিক	সেবার তালিকা	কল সেন্টারের নম্বর
১	জাতীয় জরুরি সেবা	৯৯৯
২	জাতীয় সেবা কল সেন্টার	৩৩৩ যেকোনো সেবার জন্য
৩	কৃষি কল সেন্টার	১৬১২৩
৪	প্রবাসীদের জন্য কল সেন্টার (প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়)	১৬১৩৫
৫	জাতীয় মহিলা সংস্থার তথ্য আপাকে জিজ্ঞাসা	১০৯২২
৬	স্বাস্থ্য বাতায়নে কল করে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহনের জন্য	১৬২৬৩
৭	নারী ও শিশু নির্যাতন অথবা পাচারের ঘটনা প্রতিরোধে	১০৯
৮	কল দিলেই ঘরের সামনে যাবে অ্যাম্বুলেন্স	১৬২৬৩
৯	সরকারি আইনগত সহায়তায় জাতীয় হেল্প লাইন	১৬৪৩০
১০	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হেল্পলাইন	১৬১০৮

কাজ: রাষ্ট্রের সেবা গ্রহণ ও প্রদানে প্রযুক্তিনির্ভর মাধ্যম চিহ্নিত করা

যা করতে হবে:

১. নিচের চিত্রগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি। চিত্রসংশ্লিষ্ট ঘটনায় কী করা উচিত তা নিয়ে চিন্তা করি।

২. ঘটনাসমূহের ক্ষেত্রে কী ধরনের সেবা গ্রহণ ও প্রদান করব এবং কেন করব তা ডানপাশের কলামে লেখো।

৩. সেবা গ্রহণের জন্য জরুরি সেবা তালিকা থেকে কল সেন্টারের নম্বর পাশের কলামে লিখি।

সুমাইয়ার বাবা তার পড়াশোনা বন্ধ করে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। এখন কী করা উচিত?	
 আবহাওয়ার সংবাদে জানতে পারলাম কয়েক দিনের মধ্যে সাগরে ঘূর্ণিঝড় উঠবে। সাগরে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে কী করতে হবে?	
 বাবু খুব অসুস্থ। আর দেরি করা যাবে না। এখনই হাসপাতালে নিতে হবে।	
 নুহা, জাতীয় পরিচয় পত্রে আমার নামের বানান ভুল হয়েছে। এখন কী করব?	
 আমার বাবার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এখন কী করব?	

একটি মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। কী করা উচিত?	
আমার ধানখেতে নতুন পোকার আক্রমণ হয়েছে। আমি এখন কী করব?	
আমাদের পাড়ার বস্তিতে আগুন লেগেছে। আমরা এখন কী করব?	
সামাজিক বনায়নের গাছগুলো বিনা অনুমতিতে কেটে ফেলছে। কী করতে পারি?	

আমরা সেসব সেবা চিহ্নিত করে কল সেন্টারের নম্বর লিখেছি তা সহপাঠীর সাথে আলোচনা করি এবং তাদের মতামত প্রয়োজনে লিখে রাখি।

বিপদের মুহূর্তে জরুরি নম্বরে সাহায্য চাইতে কখনোই লজ্জা বা ভয় পাওয়া উচিত নয়। আমরা অপরিচিত মানুষকে নিজের নাম, ঠিকানা বা অন্য ব্যক্তিগত তথ্য দিব না, কিন্তু জরুরি সেবাদানকারী প্রতিনিধিকে এসব তথ্য দেয়া নিরাপদ এবং বাধ্যতামূলক।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

৬. প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য ও সামাজিক ঝুঁকি

প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্ব আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। যেদিকে তাকাই দেখি প্রযুক্তির ব্যবহার। দৈনন্দিন জীবনে মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটার ইত্যাদি প্রযুক্তির ব্যবহার এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এগুলো ব্যবহারের ফলে আমাদের কিছু স্বাস্থ্য ও সামাজিক ঝুঁকি তৈরি হয়।

প্রযুক্তি অতি ব্যবহারের ফলে কী কী স্বাস্থ্যঝুঁকি ও সামাজিক ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারি?

কাজ প্রযুক্তি অতি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি ও সামাজিক ঝুঁকি চিহ্নিত করা

যা করতে হবে:

১. প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কী কী সামাজিক এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যা হয় তা চিন্তা করে নিচের খালি জায়গায় লেখো।

প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি	প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সামাজিক ঝুঁকি

সারসংক্ষেপ

আমরা মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটার ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রতি খুব বেশি আসক্ত হয়ে পড়ছি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে অতিরিক্ত সবকিছুই খারাপ। খুব বেশি প্রযুক্তি নিয়ে সময় ব্যয় করলে আমাদের শরীরে ও মনে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি ও সামাজিক ঝুঁকি সম্পর্কে আরও কিছু জানি

বেশি সময় ধরে প্রযুক্তি ব্যবহার করলে, ব্যায়াম ও খেলাধুলার মতো শারীরিক কার্যক্রম কম হয়। ফলে প্রযুক্তির অতি ব্যবহার মানুষকে শারীরিকভাবে কম সক্রিয়তার দিকে নিয়ে যায়। শিশুদের সঠিক শারীরিক বিকাশ ব্যাহত হয়। প্রযুক্তির অতি ব্যবহারের কারণে নিদ্রাহীনতা হতে পারে। বেশি সময় ধরে ডিভাইস ব্যবহারে পিঠ ও ঘাড়ে ব্যথা, চোখের সমস্যাসহ আরও কিছু শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। অনলাইনে নৃশংস ঘটনা বা মারামারি, হানাহানির ভিডিও দেখলে শিশু মানসিক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। এমনকি যেকোনো ধরনের ভীতিকর ঘটনার ভিডিয়ো, যেমন– আগুন লাগা, দুর্ঘটনার দৃশ্য,

হত্যা, বন্যা, দাবানল ইত্যাদি শিশুর মনোজগতে খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে।

আমরা প্রতিদিন মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করি। এসব প্রযুক্তি আমাদের অনেক কাজ সহজ করেছে ঠিকই, অনেক সময় এটি আমাদের সমস্যার কারণও হতে পারে। শিশুরা, এমনকি বড়োরাও মোবাইল ফোন বা টেলিভিশনে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলার সময় কমে যায়। ছেলে-মেয়েরা বাইরে গিয়ে খেলাধুলা করা বা বন্ধুদের সাথে দেখা করার বদলে শুধুই মোবাইল ফোন বা কম্পিউটারে সময় কাটায়, এতে বন্ধুদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। ছেলে-মেয়েদের শারীরিক ও মানসিকভাবে বেড়ে উঠা বাধাগ্রস্ত হয়। ইন্টারনেটে কখনো কখনো ভুল তথ্য থাকতে পারে। শিশুদের জন্য এই ভুল তথ্য অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে। প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে পড়াশোনা, খেলাধুলা, খাওয়া-দাওয়ার সময় ঠিক থাকে না। ফলে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হয়। তাই প্রযুক্তির অতি ব্যবহার না করে পরিমিত ব্যবহার করতে হবে।

৭. ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার

প্রযুক্তি আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর ব্যবহার সচেতনভাবে না করলে তা ঝুঁকির কারণ হতে পারে। তাই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

? ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কীভাবে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার করব?

কাজ: প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং নিরাপদ ব্যবহারে করণীয়সমূহ

১. কয়েকটি প্রযুক্তির নাম, এ প্রযুক্তি কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং এর নিরাপদ ব্যবহারে করণীয়সমূহ বের করে নিচের ছকে লেখো।

প্রযুক্তির নাম	প্রযুক্তিটি কেন গুরুত্বপূর্ণ	নিরাপদ ব্যবহারে করণীয়

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে আরও কিছু জানি

বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে যেসব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে তার প্রত্যেকটির নিরাপদ ব্যবহার জানা প্রয়োজন। আমাদেরকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হয়। এজন্য আমরা প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য যা করতে পারি তা হলো–

১. মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ইত্যাদির পাসওয়ার্ড গোপন রাখা।

২. বিভিন্ন সেবার জন্য আলাদা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা।

৩. কম্পিউটারে অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার এবং নিয়মিত স্ক্যান করা।

৪. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং অন্যান্য অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তিগত তথ্য বিনিময় করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা।

৫. মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাব, ইন্টারনেট ইত্যাদি অতিমাত্রায় ব্যবহার থেকে বিরত থাকা।

৬. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করা।

৭. অপ্রয়োজনে কোনো সাইটে প্রবেশ থেকে বিরত থাকা।

৮. ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা থেকে বিরত থাকা।

প্রযুক্তির সঠিক ও নিরাপদ ব্যবহার যেমন আমাদের জীবনকে সহজ ও সুন্দর করে, এর অপব্যবহার আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। এজন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতনতা বজায় রাখা অপরিহার্য।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দিই

ক) মানচিত্র-সংশ্লিষ্ট অ্যাপের সাহায্যে নিচের কোন কাজটি করবে?

☐ ছবি আঁকা ☐ টিকিট সংগ্রহ ☐ স্থান চিহ্নিতকরণ ☐ গেম খেলা

খ) তুমি রাতের আকাশের তারা স্পষ্টভাবে দেখতে চাও, এক্ষেত্রে নিচের কোন যন্ত্রের সাহায্য নেবে?

☐ অণুবীক্ষণ যন্ত্র ☐ আতশি কাচ ☐ আয়না ☐ দূরবীক্ষণ যন্ত্র

গ) দীর্ঘ সময় মোবাইল ব্যবহারের কারণে তোমার কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?

☐ চোখের সমস্যা ☐ হাতে ব্যথা ☐ মানসিক অস্থিরতা ☐ বুকে ব্যথা

২. শূন্যস্থান পূরণ করি

ক) প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা সহজ ও------------------------জীবনযাপন করি।

খ) বিজ্ঞানীরা জলীয়বাষ্পের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ------------------উদ্ভাবন করেছেন।

গ) প্রযুক্তির ---------------------ফলে স্বাস্থ্য ও সামাজিক ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে।

৩. শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নির্বাচন করি

	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
ক) ইরি, ব্রি এবং বি আর ৩৩ উন্নত জাতের গম।		
খ) সহজে অনুমান করা যায় এমন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করব।		
গ) জরুরিভাবে অ্যাম্বুলেন্স সেবা পেতে ১৬২৬৩ নম্বরে কল করব।		
ঘ) ব্লক-কোড ব্যবহার করে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারি।		

৪. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বলতে কী বোঝায়?

খ) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমরা প্রযুক্তিনির্ভর কী কী সেবা গ্রহণ করি?

গ) প্রযুক্তির অপব্যবহারে সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি কীভাবে কমানো যায়?

৫. বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক) দৈনন্দিন জীবনে কম্পিউটার কী কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

গ) প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তা আলোচনা করো।

শব্দকোষ

শব্দ	অর্থ
অণুজীব	অতি ক্ষুদ্র জীব, যা খালি চোখে দেখা যায় না।
অণুবীক্ষণ যন্ত্র	খালি চোখে দেখা যায় না এমন বস্তু দেখার যন্ত্র।
অবিভাজ্য	যা ভাঙা যায় না।
অভিযোজন	উদ্ভিদ বা প্রাণীর পরিবেশে টিকে থাকা বা খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া।
আকর্ষণ বল	দুটি বস্তুকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য যে বল কাজ করে।
আহ্নিক গতি	নিজ অক্ষের চতুর্দিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনকে আহ্নিক গতি বলে। এই গতির কারণে দিন ও রাত হয়।
আন্তঃসম্পর্ক	দুটি বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক, যেমন– বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।
আবাসস্থল	জীবের বসবাসের স্থান।
আসক্তি	নিজের ক্ষতি জেনেও, একই কাজ বেশি বেশি করা।
ইন্টারনেট	পরস্পরের সাথে সংযুক্ত অনেকগুলো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সমষ্টি।
ইলেকট্রিক ডিভাইস	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি।
উড়ুক্কু গাড়ি	এক ধরনের গাড়ি যা একই সাথে সড়ক এবং আকাশপথে চলে।
উত্তর গোলার্ধ	পৃথিবীর বিষুবরেখার উত্তর পাশের অঞ্চলকে উত্তর গোলার্ধ বলে।
উপকূলীয় অঞ্চল	সমুদ্র, হ্রদের অংশ যা তীরের কাছাকাছি থাকে।
এনিমেশন	একটি কৌশল যা স্থিরচিত্রকে গতিশীল/নড়াচড়া করতে দেখায়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

কোভিড-১৯	একটি সংক্রামক রোগ, যা ফুসফুসে তীব্র সমস্যা সৃষ্টি করে।
খাদ্যজাল	বাস্তুসংস্থানের একাধিক সম্পর্কযুক্ত খাদ্যশৃঙ্খল একত্রিত হয়ে তৈরি জালের মতো গঠন।
খাদ্যশৃঙ্খল	উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ খাদক পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে একে অপরকে খাওয়ার মাধ্যমে শক্তি স্থানান্তরের প্রক্রিয়া।
গুগল ম্যাপ	এক ধরনের ডিজিটাল মানচিত্র।
ঘর্ষণবল	কোনো বস্তুর গতিশীল অবস্থায় ঘর্ষণের কারণে বাধা প্রদানকারী বল।
ড্রোন	মনুষ্যবিহীন আকাশযান।
জিন প্রযুক্তি	যে প্রযুক্তিতে জীবকোষের জিন ব্যবহার করা হয়।
জলোচ্ছ্বাস	সমুদ্রের জল ফুলে উঁচু হয়ে উপকূলে আঘাত হানা।
টেলিস্কোপ/ দূরবীক্ষণ যন্ত্র	যা দূরবর্তী বস্তু দেখার জন্য ব্যবহার করা হয়।
তির্যকভাবে	সূর্য থেকে কৌণিকভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠে সূর্যের আলো পড়া।
দক্ষিণ গোলার্ধ	পৃথিবীর বিষুব রেখার দক্ষিণ পাশের অঞ্চলকে দক্ষিণ গোলার্ধ বলে।
পুনর্ব্যবহার	কোনো বস্তু একবার ব্যবহার করার পর ফেলে না দিয়ে অন্য কোনো কাজে ব্যবহার।
পুনঃপ্রক্রিয়া	কোনো বস্তু একবার ব্যবহার করার পর ফেলে না দিয়ে অন্য কোনো নতুন বস্তু তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা।
পশমি কাপড়	ঠান্ডা রোধ করার জন্য শীতকালে ব্যবহৃত এক ধরনের কাপড়। এই কাপড় প্রাণীর পশম দিয়ে তৈরি।
পাসওয়ার্ড	গোপনীয় নম্বর বা সাংকেতিক চিহ্ন যা কোনো ডিভাইসে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।

পরাগায়ন	ফুলের পরাগধানী হতে পরাগরেণু একই ফুলে বা একই জাতের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়া।
বার্ষিক গতি	সূর্যের চারদিকে একটি কক্ষপথে পৃথিবীর ঘূর্ণনকে বার্ষিক গতি বলে।
বাস্তুসংস্থান/ বাস্তুতন্ত্র	কোনো স্থানের সকল জীব ও জড়বস্তু এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া।
বিষুবরেখা	পৃথিবী পৃষ্ঠের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে মাঝ বরাবর কাল্পনিক রেখা। এটি পৃথিবীর পৃষ্ঠকে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে।
বীজের বিস্তরণ	পাখি, বায়ু ও অন্যান্য মাধ্যমে মাতৃ-উদ্ভিদের বীজ ছড়িয়ে পড়া।
বিভেদ তল	আলোকরশ্মি যে তলে বাধা পেয়ে দিক পরিবর্তন করে।
মেট্রোরেল	শুধু শহরের মধ্যে যে ট্রেন চলে।
মিথস্ক্রিয়া	প্রকৃতিতে বসবাসরত উদ্ভিদ, প্রাণী ও জড় উপাদানগুলো একে অপরের সাথে এবং তাদের পরিবেশের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।
মেরু	পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরে ও নিচের দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী কাল্পনিক সংযোগ সরলরেখা হলো পৃথিবীর অক্ষ। এই অক্ষের উপরের বিন্দুকে উত্তর মেরু এবং নিচের বিন্দুকে দক্ষিণ মেরু বলে।
মিশ্রণ	দুই বা ততোধিক পদার্থ একত্রে পাশাপাশি থাকে। মিশ্রণের পদার্থগুলোকে আলাদাভাবে দেখা যায়।
রাডার	তরঙ্গ ব্যবহার করে চলমান বা স্থির বস্তুর দূরত্ব, উচ্চতা, দিক নির্ণয় ও শনাক্তকরণ যন্ত্র।
রেফ্রিজারেটর	খাদ্য ও পানীয়কে ঠান্ডা করে সংরক্ষণ করার যন্ত্র।
রূপান্তর	কোনো পদার্থ বা শক্তির এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন।
রোবটিক্স	প্রযুক্তির একটি শাখা যেটি রোবটসমূহের ডিজাইন, নির্মাণ, কার্যক্রম ও প্রয়োগ নিয়ে কাজ করে।

লিভার	এক ধরনের সরল যন্ত্র, যা ভারী বস্তুকে উপরে উঠতে সাহায্য করে।
শ্বাসমূল	মাটি বা পানির উপর মূলের ছড়িয়ে থাকা উর্ধ্বমুখী শাখাপ্রশাখা, যা দিয়ে উদ্ভিদ অক্সিজেন নিয়ে শ্বাসকার্য চালায়।
শক্তি সংরক্ষণ	শক্তি অপচয় না করে পরবর্তী সময়ে ব্যবহারের জন্য জমা রাখা।
স্যাটেলাইট বা ভূ-উপগ্রহ	কৃত্রিম উপগ্রহ, যা আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও তথ্য প্রচারে ব্যবহার করা হয়।
স্মার্টবোর্ড	একাধিক সুবিধা-সংবলিত হোয়াইটবোর্ড-যেখানে লেখা যায়, আবার কম্পিউটারের মনিটর হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
সাইবার বুলিং	সামাজিক মাধ্যমে কারো সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া বা বিব্রতকর অথবা অবমাননাকর ছবি পোস্ট করা।
রাসায়নিক শক্তি	পদার্থের অভ্যন্তরে যে শক্তি সঞ্চিত থাকে।
হেলানো তল	এক ধরনের সরল যন্ত্র, যা ভারী বস্তুকে কাঠ, বাঁশ, বালু, সিমেন্ট দিয়ে তৈরি ঢালের সাহায্যে উপরে উঠাতে সাহায্য করে।
ক্রমবিকাশমান	কোনো একটি প্রযুক্তির ধারাবাহিক উন্নতি।

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য, পঞ্চম শ্রেণি–বিজ্ঞান

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **‘৩৩৩’** কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য